বেতার বাংলা

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩৩

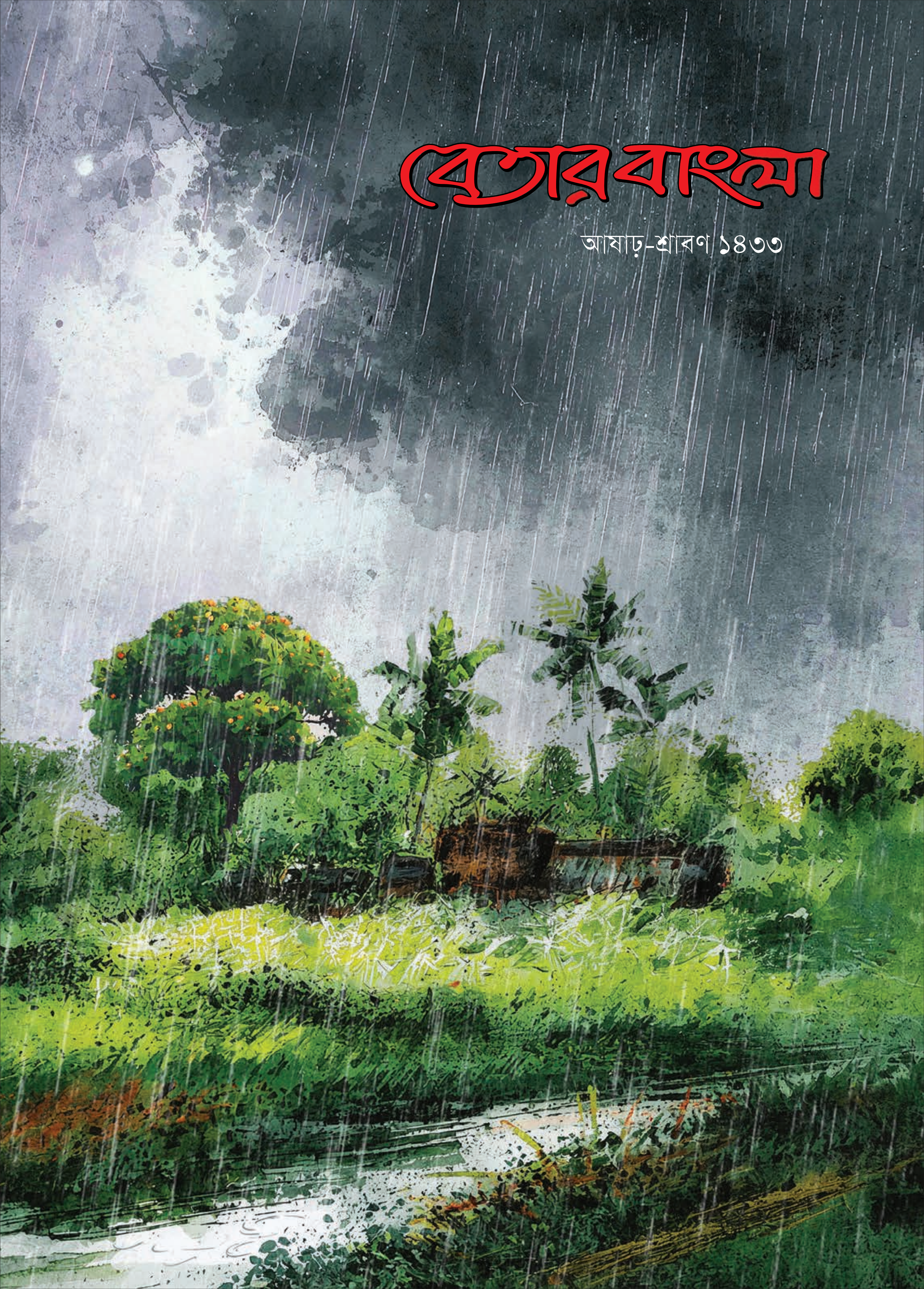

১১ জুন ২০২৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নিকট ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনের মন্ত্রিসভা কক্ষে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী নতুন অর্থবছর (২০২৬-২০২৭)-এর জন্য অনুমোদিত বাজেট হস্তান্তর করেন

২৬ মে ২০২৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ময়মনসিংহের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

১৭ মে ২০২৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাকায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিক ও সম্পাদকমণ্ডলীর সাথে বৈঠক শেষে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন

বেতার বাংলা
দ্বিমাসিক পত্রিকা
আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩৩ • ১৫ জুন ২০২৬ - ১৫ আগস্ট ২০২৬

আঞ্চলিক পরিচালক
মোঃ আল আমিন খান

সম্পাদক
মো. আরিফুর রহমান

সহ-সম্পাদক
সৈয়দ মারগুব ইলাহি

প্রচ্ছদ
আদনান অভি

মুদ্রণ সংশোধক
মোঃ হাসান সরদার

আলোকচিত্র
বেতার প্রকাশনা দপ্তর, পিআইডি,
বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্র,
ইউনিটসমূহ এবং
মোস্তাফিজুর রহমান মিন্টু

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
৩১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৪৮১৩০৩৯
(আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩
(সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯
(বিজনেস ম্যানেজার/ফ্যাক্স)
ওয়েব সাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla.bb

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাক মাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

সম্পাদকীয়

ঋতু পরিক্রমায় গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে জনজীবন যখন ওষ্ঠাগত, তখনই প্রকৃতিতে শীতল, সতেজ, স্নিগ্ধতা বয়ে আনে বর্ষা ঋতু। প্রায়শ আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা, অঝোরধারায় বৃষ্টি, নদী-খাল-বিল-পুকুর পানিতে থইথই, কদম-কেয়া-জুঁই-বেলির মিষ্টি গন্ধ– বাংলাদেশের প্রকৃতিকে মন ভরে উপভোগ করতে অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে হাজির হয় বর্ষা। বর্ষার এই রূপ ও রসকে বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি পরিপূর্ণতা দিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর গান ও কবিতায় বর্ষা কেবল ঋতু নয়, বরং তা মানবমনের গভীরতম অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। “আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে...” কিংবা “বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল”– রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বর্ষা হয়ে উঠেছে বিরহ, মিলন এবং নতুনের আবাহনের প্রতীক। বর্ষার এই প্রবহমানতা আমাদের অন্তরেও নবজীবনের সঞ্চার করে।

১৫ আগস্ট দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর প্রাক্তন চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মবার্ষিকী। তিনি তাঁর চার দশকের রাজনৈতিক জীবনে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আপসহীন নেত্রী হিসেবে পরিচিতি, সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন, সংসদীয় নির্বাচনে সর্বোচ্চ আসনে বিজয়ের রেকর্ড, বাংলাদেশে মেয়েদের শিক্ষার প্রসার ও নারীদের কর্মসংস্থান তথা নারী অধিকারের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ– এসব কীর্তির জন্য বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

হিজরি বর্ষের প্রথম মাস মহররমের ১০ তারিখ পবিত্র আশুরা। আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগের অনুপ্রেরণায় মুসলমানগণ নফল রোজা ও ইবাদতের মাধ্যমে এ দিনটি পালন করে থাকে। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ বজায় রাখতে, হানাহানি ভুলে সবাই মিলেমিশে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখতে মহররমের শিক্ষা আজও সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৪-এর জুলাই গণ-আন্দোলন এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। বৈষম্যবিরোধী এই আন্দোলন কেবল একটি কোটা সংস্কারের দাবিতে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা পরিণত হয়েছিল রাষ্ট্রকাঠামো সংস্কার, দুর্নীতি উচ্ছেদ এবং সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার এক বৃহত্তর গণ-অভ্যুত্থানে। এটি আমাদের জাতীয় জীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুনরুদ্ধার, মানবাধিকার রক্ষা এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে নিরন্তর প্রেরণা জোগাবে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর একটি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অসম্ভব। বৃক্ষরোপণ, প্লাস্টিক দূষণ রোধ এবং প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার কোনো বিকল্প নেই। এ বাস্তবতায় পরিবেশ রক্ষায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই, বিশেষ করে অতি সম্প্রতি উদ্বোধনকৃত ‘পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ’ কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

পরিশেষে, বর্ষার স্নিগ্ধতা আমাদের মনে যেমন শান্তির বার্তা নিয়ে আসে, তেমনি বাস্তবতার কঠিন পথ পাড়ি দেওয়ার সাহসও জোগায়। ‘বেতার বাংলা’র বর্ষা সংখ্যাটি চিন্তাশীল পাঠক ও সুধীজনের মননশীলতার খোরাক জোগাবে– এই প্রত্যাশা করি।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

সংগ্রাম, সাহস ও গণতন্ত্রের পথরেখায় এক অবিচল নেত্রীর ইতিহাস - প্রফেসর ড. মোহাঃ হাছানাত আলী ৩

বাংলার বর্ষা - প্রফেসর মোঃ শাহাদত হোসেন ৬

তিনি আমাদের লোক - রফিকুর রশীদ ১০

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মহররমের শিক্ষা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য - মোঃ ওমর ফারুক ১৪

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, কর্তৃত্ববাদী শাসনের পতন ও উজ্জ্বল আশাবাদ - সৈয়দ তোশারফ আলী ১৬

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের বর্ষা ঋতু - জায়েদুল আলম ২০

দেশি ও স্থানীয় পরিবেশ উপযোগী বৃক্ষরোপণ - আশিকুর রহমান সমী ২৩

শ্রোতার কল্পনার জগৎ : কেন বেতার এখনো অনন্য? - সৈয়দ সাবাব আলী আরজু ২৬

বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতারের বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ ৪৪

বেতার সম্প্রচার তথ্য ও ফিডব্যাক

সংবাদ সূচি ৫১

সম্প্রচার সময়সীমা ৫৩

সম্প্রচারিত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ ৫৬

শ্রোতা সম্পৃক্ততার চিত্র ৬৩

বেতার সংবাদ ৬৫

বেতার অ্যালবাম ৬৮

বেতার শ্রোতা ও পাঠকের পাতা ৭৩

বেতার শ্রোতার চিঠি ৮৪

গল্প

গন্ধ - পল্লব শাহরিয়ার ২৮

বৃষ্টি - মুহাম্মদ ফজলুল হক ৩২

কবিতা

হাসান হাফিজের দুটি কবিতা ৫

পৃথিবীর প্রথম মানুষ নই - রেজাউদ্দিন স্টালিন ৯

অবিচল দেবদারু - মজিদ মাহমুদ ৯

বৃষ্টি মাতাল মধ্যরাতে - মনসুর আজিজ ১৩

বিলের ভিতর ঘর - তপন বাগচী ১৩

আষাঢ় বেঁধেছে ঘর - সুমন সরদার ২২

অদ্ভুত জিন্দেগির নান্দীপাঠ - হাসান সেলিম ২২

কেবিননামা - মহসিন আহমেদ ৩১

আষাঢ় আসার খবর রটেছে মেঘে - মাহবুবা ফারুক ৩১

তরুপল্লব

এলো আষাঢ় মাস - আবদুল লতিফ ৩৬

বর্ষার অপরূপ প্রকৃতি - শারমিন নাহার ঝর্ণা ৩৬

হুলুস্থুল - আলমগীর হোসেন ৩৬

সবুজ গোয়েন্দা মিকু - সাধন সরকার ৩৭

মা আমার মা - নকুল শর্ম্মা ৩৮

ছন্দে আনন্দে - জেবুন্নেছা মুনিয়া ৩৮

বর্ষাকালে - মেহেদী হাসান মামুন ৩৮

আপলোডে কোলাব্যাঙ - এস এম তিতুমীর ৪০

বর্ষাকাল - এ কে এম মোস্তফা ৪২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - অপু বড়ুয়া ৪২

আমি ফুল - মাহমুদা সিদ্দিকা ৪২

বর্ষার বৃষ্টি - ইয়াছিন ইবনে ফিরোজ ৪৩

সংগ্রাম, সাহস ও গণতন্ত্রের পথরেখায় এক অবিচল নেত্রীর ইতিহাস

প্রফেসর ড. মোহাঃ হাছানাত আলী

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস কেবল ক্ষমতার পালাবদলের ইতিহাস নয়– এটি সংকটের ভেতর দিয়ে উত্তরণের ইতিহাস, অন্ধকার ভেদ করে আলোর সন্ধান পাওয়ার ইতিহাস। এই ইতিহাসে কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা সংকটকে ভয় পান না; বরং সংকটই তাঁদের পরিচয় নির্মাণ করে। বেগম খালেদা জিয়া তেমনই এক নাম– যাঁর রাজনৈতিক জীবন মূলত সংকটের সঙ্গে লড়াইয়ের এক দীর্ঘ উপাখ্যান।

'সংকটকালে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান অপরিসীম'– এই শিরোনাম কোনো আবেগপ্রসূত উক্তি নয়; বরং একটি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ। তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় যেন সংকটের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠা এক-একটি মাইলফলক– যেখানে ব্যক্তিগত শোক, রাজনৈতিক প্রতিকূলতা, রাষ্ট্রীয় সংকট এবং গণতন্ত্রের প্রশ্ন এক সুতোয় গাঁথা।

ব্যক্তিগত শোক থেকে জাতীয় দায়িত্ব : এক নারীর অভ্যুদয়

খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক যাত্রা কোনো পরিকল্পিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফল নয়; বরং এটি এক অনিবার্য দায়িত্ববোধের ফল। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড শুধু একটি পরিবারের নয়, একটি রাষ্ট্রের জন্যও গভীর সংকটের মুহূর্ত সৃষ্টি করেছিল। সেই শোকের ভেতর থেকেই খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক আত্মপ্রকাশ।

এই সময়টিই ছিল তাঁর প্রথম পরীক্ষা– একজন গৃহিণী থেকে জাতীয় নেত্রী হয়ে ওঠার কঠিন রূপান্তর। তিনি যদি তখন পিছু হটতেন, ইতিহাস হয়তো অন্যরকম হতো। কিন্তু তিনি পিছু হটেননি; বরং শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে তিনি এগিয়ে এসেছেন।

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ : রাজপথের সংগ্রামী নেত্রী

১৯৮০-এর দশক ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অস্থির সময়। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যখন গণতন্ত্রপন্থি শক্তিগুলো একত্রিত হচ্ছিল, তখন খালেদা জিয়া হয়ে ওঠেন প্রতিরোধের অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর। তিনি বারবার গৃহবন্দি হয়েছেন, কারাবরণ করেছেন, তবুও তাঁর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়নি। রাজপথে তাঁর উপস্থিতি ছিল প্রতিবাদের প্রতীক– একটি নির্ভীক অবস্থান, যা সাধারণ মানুষের মনে সাহস জুগিয়েছে।

সেই সময়ের খালেদা জিয়া কেবল একজন রাজনীতিবিদ নন; তিনি ছিলেন একটি আন্দোলনের প্রাণ, একটি জাতির আশা।

১৯৯০-এর গণ-অভ্যুত্থান ছিল সংকট ভাঙার এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত

১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশের ইতিহাসে এক মোড় পরিবর্তনের ঘটনা। এই আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার যুগপৎ নেতৃত্ব স্বৈরাচারের পতন ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি ছিল একটি জাতীয় সংকটের অবসান– একটি রাষ্ট্রের পুনর্জন্ম। এই আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার দৃঢ়তা, কৌশল এবং জনসম্পৃক্ততা তাঁকে গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

গণতন্ত্রের পুনর্গঠন ও রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্বে বেগম খালেদা জিয়ার সাফল্য তাঁকে আপসহীন নেত্রীতে ভূষিত করছিল। ১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়া একটি নতুন সংকটের মুখোমুখি হন– গণতন্ত্রকে কেবল পুনরুদ্ধার নয়, তাকে টিকিয়ে রাখা।

প্রেসিডেন্সিয়াল থেকে সংসদীয় ব্যবস্থায় ফিরে আসা, প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্গঠন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা– এসব ছিল তাঁর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলার চেষ্টা করেছেন এবং একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছেন। রাজনৈতিক সংকট সমাধানে রাজপথের প্রতিরোধ তাঁকে আপসহীন অবস্থানের প্রতিচ্ছবিতে পরিণত করে।

বাংলাদেশের রাজনীতি কখনোই স্থির ছিল না। বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক অচলাবস্থা, নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক, সহিংসতা– এসব সংকটের মধ্যেও খালেদা জিয়া তাঁর অবস্থানে অটল থেকেছেন। তিনি আপসের চেয়ে প্রতিরোধকে বেছে নিয়েছেন– যা একদিকে তাঁর সমর্থকদের কাছে দৃঢ়তার প্রতীক, অন্যদিকে সমালোচকদের কাছে রাজনৈতিক কঠোরতার নিদর্শন। কারাবরণ ও ব্যক্তিগত ত্যাগ তাঁকে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর জীবনে রাজনীতির সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা আসে তখন, যখন ক্ষমতা নেই, স্বাধীনতা নেই, তবুও অবস্থান ধরে রাখতে হয়। বেগম খালেদা জিয়ার কারাবরণ সেই পরীক্ষারই একটি অংশ।

তাঁর সমর্থকদের মতে, এটি কেবল একটি আইনি প্রক্রিয়া নয়; বরং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ। এই সময় তাঁর ধৈর্য, নীরবতা এবং দৃঢ়তা তাঁকে আরো প্রতীকী করে তোলে। বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন সংকটের মধ্যে এক আলোর রেখা। সংকটের রাত যত গভীর হয়, ভোর তত কাছাকাছি আসে– এই বিশ্বাসই যেন বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবনের মূল সুর। তিনি ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক বৃক্ষ– যার ডালপালা ভেঙেছে, পাতা ঝরেছে, তবুও শিকড় উপড়ে যায়নি। তিনি এক নদী– যাকে বারবার থামাতে চাওয়া হয়েছে, তবুও সে নিজের গতিপথ খুঁজে নিয়েছে। তিনি এক প্রদীপ– যাকে নিভিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছে, তবুও সে অন্ধকারে আলো ছড়িয়েছে।

যদিও তাঁর অবদান অনেকের কাছে অপরিসীম হলেও নিন্দুকেরা তাঁর শাসনামলের রাজনৈতিক সহিংসতা, প্রশাসনিক দুর্বলতা– আলোচনার বাইরে রাখে না। তবে ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে এই আলো-ছায়া দুটোই দেখতে হবে। কারণ, একজন নেতার প্রকৃত মূল্যায়ন তাঁর সাফল্য ও ব্যর্থতার সম্মিলিত বিশ্লেষণেই সম্ভব। সংকট পেরিয়ে ইতিহাসের এক স্থায়ী নাম হলেন বেগম খালেদা জিয়া। বেগম খালেদা জিয়ার জীবন আমাদেরকে শিক্ষা দেয়– সংকট কোনো শেষ নয়; বরং এটি নতুন সূচনার সম্ভাবনা। তিনি নিশ্চিতভাবে আলোচিত কিন্তু তিনি অপ্রাসঙ্গিক নন। বাংলাদেশের প্রতিটি বড় রাজনৈতিক সংকটে তাঁর উপস্থিতি– সরাসরি বা পরোক্ষভাবে– অনুভূত হয়েছে। দেশের সংকটময় মুহূর্তে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান অপরিসীম।

'সংকটকালে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান অপরিসীম'– এই বাক্যটি তাই কেবল একটি প্রশংসা নয়; এটি একটি ইতিহাসের প্রতিধ্বনি, একটি সময়ের সাক্ষ্য, একটি সংগ্রামের সারাংশ। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় তিনি এক অনিবার্য অধ্যায়– যার আলো নিভে গেলেও, তার উষ্ণতা ইতিহাসে দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হবে।

লেখক : উপাচার্য, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়

হাসান হাফিজের দুটি কবিতা

অকুণ্ঠ প্রস্তুত

গর্জে ওঠো বাংলাদেশ
তোমার সঞ্চয়ে আছে
ঋদ্ধ এক রক্তঝরা অভিজ্ঞতা
অনন্য অর্জন
সে অধ্যায় ব্যথাবিদ্ধ
একাত্তর– তুমি এক সুকৃতির নাম।

অস্ত্র ধরো, হানাদার শত্রুদের
হঠাও, হটিয়ে মুক্ত করো
অধিকৃত মাতৃভূমি
প্রাণের উত্তাপ দিয়ে
মোছো অশ্রুজল।

স্বাধীনতা তোমাকে রক্ষায়
আরো যদি রক্তপাত প্রয়োজন হয়
কখনোই দ্বিধা করব না।

আর জন্মে চরণেরই দাসী হইও

আউলা হইল মন, পইড়া রইল বাঁশি
বিরহ তোমারে আমি আহ্লাদে পিরিতি করি
আলুথালু মরা গাঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়ি
আপনকার অঙ্গ যেন, আগলাই ভালোবাসি
এমন ডাঙর সত্য ত্রিভুবনে দ্বিতীয়টি নাই
বিরহ তোমার তুষের অগ্নি একেলা পোহাই,
আহা কী সোন্দর বোধি, মনোসখী বিরহ তোমার
দিবানিশি আহা উহুঁ, কাজেকম্মে ছন্নছাড়া একাকার
বিরহ তোমার সঙ্গে চলিতেছে অসম লড়াই
চিকনগুনিয়া তুমি, দূরে থাকি, বহুতই ডরাই
তিষ্ঠাতে দাও না তুমি উচ্ছেদের সর্বভুক চাষি
তুমি শত্রু, জেনেশুনে বিষে নীল, শূন্যতার প্লাবনেও ভাসি
বিরহ নিপাত যাও তোমার নিকুচি করি তুমি সর্বনাশী
আর জন্মে হইও তুমি অনাত্মীয় চরণেরই দাসী!

বাংলার বর্ষা

প্রফেসর মোঃ শাহাদত হোসেন

"ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।"
–বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার বর্ষা নিয়ে লিখতে গেলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাদ দিয়ে তা কল্পনাও করা যায় না। তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'বর্ষামঙ্গল কবিতা' নামক গানটির প্রথম কলি দিয়েই তাই আমিও আমার আজকের লেখা শুরু করেছি। আসলে বাংলা ভাষার প্রায় সকল কবি ও সাহিত্যিক বর্ষাকে নিয়ে প্রচুর লিখেছেন। সেসব লেখার উদ্বৃতি দিতে গেলে নিজের আর কিছুই লেখা হবে না। অতএব, কবি-সাহিত্যিকদের কথা নয়, বরং নিজের কথাই বলি।

বাংলার ঋতুচক্রে বর্ষা মহান সৃষ্টিকর্তার এক অনবদ্য সৃষ্টি। বর্ষার রিমঝিম শব্দ যেমন এ দেশের অনেক মানুষকে কবি হতে রসদ জুগিয়েছে, তেমনি বর্ষার ঢেউ আর মাঝির জীবন বাজি রেখে নৌকা চালানো সৃষ্টি করেছে অনেক সাহিত্যিককে। শুধু তা-ই নয়, বর্ষার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বাড়িঘর হারিয়ে একদিকে সর্বস্বান্ত হয়েছে কৃষক, অন্যদিকে হাট-ঘাট-মাঠ ডুবে পলিতে ভরে সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাচ্ছে সেই কৃষককেই।

তাই বর্ষা শুধু একটি ঋতু নয়, এ যেন আবহমান বাংলার মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি।

ঋতুচক্র অনুযায়ী আষাঢ়-শ্রাবণ মাস বাংলাদেশে বর্ষাকাল। তবে আবহাওয়াবিদগণ বাংলাদেশকে মূলত তিনটি দৃশ্যমান ঋতুতে ভাগ করে আবহাওয়ার বিবরণ দেন এবং সেই হিসেবে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এখানে বর্ষাকাল স্থায়ী হয়। অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শীতকালের মাঝামাঝি বৃষ্টিবহুল সময়কে বর্ষাকাল বলা হয়। উল্লেখ্য, জুন মাসে মৌসুমি বায়ু আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে বর্ষাকাল শুরু হয়।

বাংলাদেশে ঋতুচক্র শুরু হয় গ্রীষ্মকাল দিয়ে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মের প্রথম মাস বৈশাখ, এটি কালবৈশাখীর মাসও। প্রচণ্ড ঝড় সব লন্ডভন্ড করে দেয়। আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায়। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বইতে থাকে। বজ্রের গর্জনে হতবিহ্বল সবাই। সরাৎ সরাৎ শব্দে গাছের ডাল ভেঙে যায়। কোনো কোনো বাড়ির টিনের চাল উড়ে যায়। কালবৈশাখীর তাণ্ডবে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় পুরো গ্রাম।

বৈশাখের পর আসে জ্যৈষ্ঠ। এ সময় কখনো কালবৈশাখীর তাণ্ডব দেখা যায়, কখনো দেখা যায় অঝোরধারায় বৃষ্টি। তাই জ্যৈষ্ঠ হলো বর্ষার আগমনি বার্তাবাহক। ঋতুচক্রে আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষাকাল

হলেও প্রকৃতপক্ষে এর ব্যাপ্তি আরো বেশি। শরৎকাল পুরোটাই অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন মাসেও এখানে বর্ষা বিরাজ করে। আশ্বিনের শেষ থেকে হেমন্তের পদচারণা শুরু হয়।

বর্ষাকালে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। এ বায়ু ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসে বলে এতে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে। অন্যদিকে এ সময় বাংলাদেশের সর্বত্র পানি থাকে এবং তা বাষ্পে পরিণত হয়ে জলীয় বাষ্পপূর্ণ মৌসুমি বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়। জলীয় বাষ্পপূর্ণ এ বায়ু প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশে পরিচলন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত ঘটায়। সেজন্য বর্ষাকালে বাংলাদেশে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মোট বৃষ্টিপাতের পাঁচ ভাগের চার ভাগই বর্ষাকালে হয়ে থাকে। মাঝেমাঝে মনে হয়, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামছে। আর এ বৃষ্টিই বাংলার বর্ষাকে মহিমান্বিত করেছে।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরতাপের পর বর্ষা মানুষের জীবনে যেন স্বস্তি নিয়ে হাজির হয়। প্রচণ্ড উত্তাপে মানুষ ও পশুপাখি যখন ছটফট করতে থাকে, দুঃসহ তাপে গাছ ও লতাপাতা যখন ঝিমিয়ে পড়ে, তখনই বৃষ্টিধারা নেমে এসে প্রকৃতিকে সজীবতা দান করে। মানুষ ও পশুপাখি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তৃষিত পৃথিবী বর্ষার পানি পেয়ে তৃষ্ণা থেকে মুক্তি লাভ করে শীতল হয়।

সুফিয়া কামাল বর্ষার আগমনি চিত্র এঁকেছেন অসাধরণ মমতায়। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে বলেছেন–

আমি বর্ষা, আসিলাম গ্রীষ্মের প্রদাহ শেষ করি,
মায়ার কাজল চোখে, মমতার বর্মপুট ভরি।

বাংলাদেশে বর্ষা শুধু একটি ঋতু নয়, বরং একটি জীবনব্যবস্থা, একটি সংস্কৃতি। গ্রীষ্ম ও শীতের জীবনাচার পুরো পালটে যায় বর্ষাকালে। হাট-ঘাট-মাঠ ডুবে যায়। দেশের অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে নৌকা। হাওরাঞ্চলসহ অনেক জায়গাতেই তখন মানুষের পেশারও পরিবর্তন হয়। কৃষিকাজের সুযোগ না থাকায় মৎস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে অধিকাংশ মানুষ। এরা অস্থায়ী মৎস্যজীবী।

হেমন্তের ধু-ধু মাঠে বর্ষায় শুধু পানি আর পানি। খনার বচনে এ চিত্র ফুটে উঠেছে আরো স্পষ্টভাবে। বর্ষায় নাও, হেমন্তে পাও।

কখনো কখনো বর্ষা আবির্ভূত হয় ভয়ংকররূপে। টানা বর্ষণে নদী ও হাওর পানিতে ভরে যায়। উজানের পানি এসে তাতে যুক্ত হয়, সৃষ্টি হয় বন্যার। নদীর দুকূল উপচিয়ে পানিতে হাট-ঘাট-মাঠ ডুবে যায়। গ্রাম-শহর-বন্দর তলিয়ে যায়। ঘরবাড়িও তলিয়ে যায়, ফলে মানুষ হয় গৃহহারা। জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সুখের স্বপ্ন ভেসে যায় বন্যার পানিতে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে বন্যা অন্যতম। প্রায় প্রতি বছরই দেশের কোনো না কোনো অঞ্চলে বন্যা হয়ে থাকে। এসব বন্যা অল্পদিন স্থায়ী হলেও, কখনো কখনো তা দীর্ঘমেয়াদি হয়। বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এর প্রধান কারণ। এছাড়া পাহাড়ি ঢল, নদী ভরাট হয়ে যাওয়া, অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট নির্মাণ এবং সড়কে পর্যাপ্ত কালভার্ট বা ব্রিজ না থাকাও বন্যা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

বাংলার ঋতুচক্রে বর্ষা মহান সৃষ্টিকর্তার এক অনবদ্য সৃষ্টি। বর্ষার রিমঝিম শব্দ যেমন এ দেশের অনেক মানুষকে কবি হতে রসদ জুগিয়েছে, তেমনি বর্ষার ঢেউ আর মাঝির জীবন বাজি রেখে নৌকা চালানো সৃষ্টি করেছে অনেক সাহিত্যিককে। শুধু তা-ই নয়, বর্ষার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বাড়িঘর হারিয়ে একদিকে সর্বস্বান্ত হয়েছে কৃষক, অন্যদিকে হাট-ঘাট-মাঠ ডুবে পলিতে ভরে সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাচ্ছে সেই কৃষককেই

এ বন্যাই আবার পলিমাটি দিয়ে ফসলি জমিকে উর্বর করে তোলে। উর্বর জমিতে কৃষক সোনালি ফসল ফলায়। প্রকৃতি সত্যিই বৈচিত্র্যময়! যে বন্যা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সে বন্যাই এ দেশের ধান উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শুধু তা-ই নয়, আমরা হলাম ভাতে মাছে বাঙালি। আর এ প্রবচনকে সার্থক করতে বর্ষার অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বর্ষার প্লাবনের ফলে বাংলাদেশের কৃষিজমিগুলো উর্বর হয়ে ধান উৎপাদনে সহায়ক হয়। তেমনি, বর্ষাকালে খাল-বিল ডুবে যাওয়ায়, নদী-নালাতে প্রচুর পানি থাকায় মাছের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বর্ষাকালে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মাছের প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য বর্ষার নতুন পানি খুবই উপযোগী। এ সময় মাছের বৃদ্ধিও বেশি হয়। জেলেদের কাছে রোদ বা বৃষ্টি বাধা হতে পারে না, তারা ছোট ছোট নৌকায় হাওরে বা নদীতে মাছ ধরে আর মনের সুখে গান গায়।

বর্ষা আমাদের ফলের ঋতুও। যদিও জ্যৈষ্ঠকে বলা হয় মধুমাস, তবে এ কথা সত্যি যে, মধুমাসে পাকতে শুরু হওয়া ফলগুলো আষাঢ়-শ্রাবণেও আমাদের সুমধুর ফলের স্বাদ দিয়ে যায়। এসব ফলের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, তাল প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল।

লিচু সবচেয়ে রসালো ফল, তবে একদম ক্ষণস্থায়ী। জ্যৈষ্ঠতে শুরু হয়ে জ্যৈষ্ঠতেই শেষ। জামও সুমধুর ও সুপ্রিয় ফল। জ্যৈষ্ঠতে শুরু হয়ে আষাঢ় অবধি দেখতে পাওয়া যায়। তালের কাঁচা শাস যেমন মজার, তেমনি পাকা তালের রসের পিঠা আরো বেশি মজার। তবে আম ও কাঁঠাল জ্যৈষ্ঠতে শুরু হলেও শ্রাবণ পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা আমের জন্য বিখ্যাত, কাঁঠালের জন্য বিখ্যাত নরসিংদী ও গাজীপুর জেলা।

গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া, সোনালু ফুটলেও দেখা যায় বর্ষা অবধি। তবে বর্ষার ফুল বলতে কদমকেই বোঝায়। অসাধারণ সৌন্দর্যের ফুল কদম। বাংলা সাহিত্যে এ ফুলের বিবরণ গদ্যে ও পদ্যে সমহারে দেখা যায়।

ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ে– মন করে হায় ব্যাকুল!
অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মনহরিলী কদম ফুল।
নিদারুণ তার রূপের বাহার, সাদা পাড়ে হলুদ শাড়ি;
সেজেগুজে হাতছানি দেয়, কদমডালে তার বাড়ি।

বর্ষাকালে এ দেশের মানুষ কিছুটা অবসর সময় কাটায়। তাই গ্রামাঞ্চলে বিবাহানুষ্ঠান, পালাগান, কুস্তি ও হাডুডু খেলাসহ নানা অনুষ্ঠানের সময়কাল এই বর্ষা। এমনকি গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থের বাড়িতে প্রায়ই আড্ডা জমে। গ্রামের মুরুব্বিরা কোনো এক বাড়ির বাংলাঘরে বসে হুঁকোয় টান দিতে দিতে জীবনের গল্প বলেন, অন্যের নিন্দা করেন, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা আঁটেন। তরুণেরা তাসের আড্ডায় মেতে ওঠে। কোনো বনেদি বাড়ির বাংলাঘরে চলে কেরাম খেলার ধুম।

কখনো টানা কয়েক দিন বৃষ্টি চলতে থাকে। চালভাজা, সেদ্ধ মিষ্টি আলু, বাদাম ভাজা খেতে খেতে গ্রামের যুবক-বৃদ্ধ সবাই গান ধরে। সেই গানের সুরে নববধূর বুক আনন্দে ভরে ওঠে। জীবন হয়ে ওঠে মধুর, সুখের।

সে তো গেল বর্ষার গ্রামের কথা, কিন্তু শহরের অবস্থা কেমন? শহরে মাঠ-ঘাট তেমন একটা না থাকলেও রাস্তায় পানি জমে যায়। আর যেখানে পানি জমে না, সেই রাস্তা হয়ে ওঠে কর্দমাক্ত। অফিসে বা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে যেতে যেতে জামাকাপড় কাদায় মাখামাখি। শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশের বড় বড় ঠিকাদারেরা রাস্তার সব কাজ শুরু করেন বর্ষাকালে। ভালো ভালো রাস্তাগুলো খুঁড়ে, পানি-কাদায় একাকার করে যানবাহন চলাচলে জট লাগিয়ে দেন। অফিসের বস বা দোকানের মালিককে দেরিতে আসার কারণ ব্যাখ্যা করা অধস্তনের পক্ষে খুব সহজ হয়ে যায়। শুধু বিরস বদনে বলতে হয়, জ্যামে আটকা পড়েছিলাম, স্যার।

তবে আধুনিক শহুরে মানুষও এখন বর্ষাকে উপেক্ষা করে না, বরং উপভোগ করে। তাই সবারই প্রত্যাশা থাকে বিকেলের মধ্যেই, বৃষ্টি শুরুর আগেই বাড়ি ফেরার। আজকাল শহরের মানুষ ঘরের বারান্দায় বসে বৃষ্টি উপভোগ করতে করতে সুন্দর কোনো মিউজিক চালিয়ে দেয়। বৃষ্টি আর মিউজিক মিলে নতুন এক অপূর্ব সংগীতের রচনা করে, হৃদয়কে দোলা দেয়। অন্যদিকে অফিস বা ব্যবসায়ে ছুটির দিনে ভুনা খিচুড়ি হয়ে উঠে শহরবাসীর অতি প্রিয় খাবার। মাঝেমধ্যে মাংস দিয়ে চিতই পিঠা কিংবা চ্যাপা শুঁটকির ভর্তা দিয়ে চাপটি পিঠা খেতে বড়ই ভালো লাগে, নিজেকে বাঙালি মনে হয়।

তাই বলা যায়, গ্রাম ও শহর সবখানেই এখন বর্ষার আবেদন বহুমুখী। মূলত বর্ষা এখন রূপময়, কাব্যময়, বিষাদময়, ভালোবাসাময় ও প্রেমময় এক ঋতুর নাম। শুরুটা যেমন ছিল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে, তাই শেষটাও করতে চাই তাঁর কথা ধার করেই। বাংলার বর্ষা নিয়ে কবিগুরু বলেছেন,
"এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরষায়!
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।"

লেখক : অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
গুরুদয়াল সরকারি কলেজ, কিশোরগঞ্জ

পৃথিবীর প্রথম মানুষ নই

রেজাউদ্দিন স্টালিন

আমি পৃথিবীর প্রথম মানুষ নই
শেষ মানুষও না
নদীতে আমি প্রথম
স্নান করিনি– অন্তিম স্নানও না

সূর্যের জন্মেরও আগে
আমার অস্তিত্ব– সূর্য না থাকলেও
যে সব গ্রন্থে মানুষ মহিমান্বিত
তা মানুষের লেখা

মানুষের চেয়ে উৎকৃষ্ট বৃক্ষ
মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মাছ
মানুষের চেয়ে মনোরম নদী

মানবের অহম চূর্ণ হয় পাহাড়ের কাছে– সমুদ্রের বিশালতায়
ব্রহ্মাণ্ড
একদিন শুধু নীরবতা
পালন করবে ব্রহ্মাণ্ড
যা সে অর্জন করেছিলো জন্মের পর
আবার সে চিৎকার করবে
মৃত্যুর আগে

কোনোদিন নীরব থাকব না আমি
চিৎকারও করব না

আমি কোনোদিন জন্মগ্রহণ করিনি

অবিচল দেবদারু

মজিদ মাহমুদ

তুমি ছিলে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীন প্রাকার।
বহিরাগত শত্রুদের নিক্ষিপ্ত গোলায়
তোমার শরীর বিক্ষত হয়েছে বহুবার,
তবু অমলিন ছিল তোমার অন্তর্লোক।

তোমার রণনীতি ছিল শত্রুর নির্ঘুম রাত,
অদৃশ্যের কালিতে অঙ্কিত তোমার রূপ।
অনুচ্চারিত নীরবতায় অনুরণিত নাম।

তুমি ছিলে রণাঙ্গণে অকুতোভয়
জননী ও জন্মভূমির সম্মিলিত প্রতিমা।
যুদ্ধের উত্তুঙ্গ মুহূর্তে
ঝলসে উঠেছে তীক্ষ্ণ খড়্গ।

সময়ের দোলাচলে
অবিচল নাবিকের মতো
সামলে নিয়েছ শত ঘূর্ণিপাক।

সুদীর্ঘ দেবদারু– তোমার বিস্তৃত প্রকাশ।
তুমি ছিলে গৃহহীন পাখিদের আশ্রয়,
পল্লবে জমেছিল কষ্টের অশ্রুবিন্দু।

তোমার দুর্গম পথ, নির্মম বন্দিশালা–
চলার পথ রুদ্ধ করতে পারেনি–
কারণ মাটির গভীরে তোমার শিকড়।
পুরোনো দেবদারুর মতো তুমি লম্বমান।

ইতিহাসের দীর্ঘ করিডোরে
এখনো শুনি তোমার পদধ্বনি।

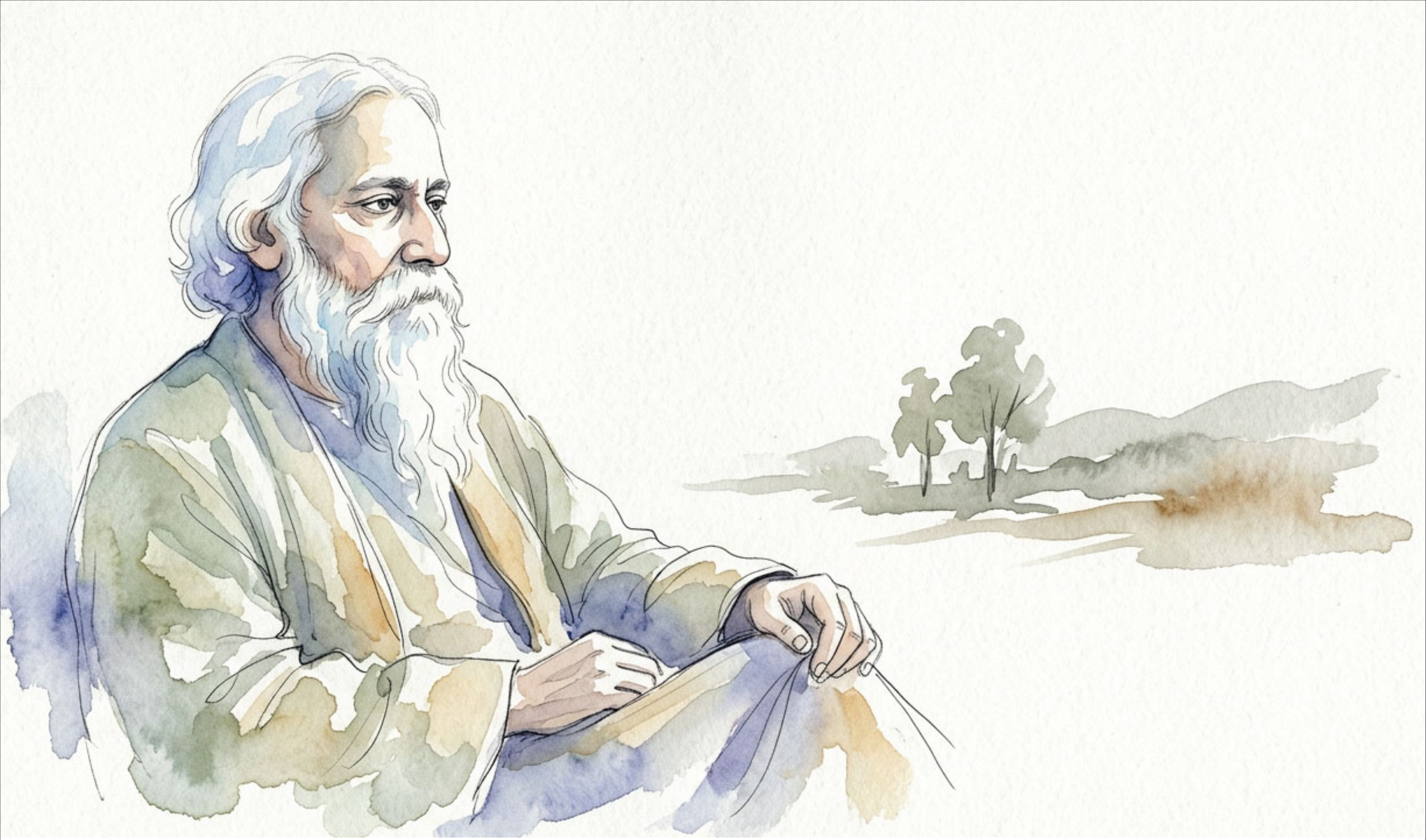

তিনি আমাদের লোক

রফিকুর রশীদ

বিস্ময়কর এক প্রতিভার নাম রবীন্দ্রনাথ। পেয়েছেন দীর্ঘ জীবনপরিধি। বিপুল বিচিত্র সৃষ্টিকর্ম দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ করেছেন তাঁর সৃজনমুখর জীবনপাত্র। জীবনের ধন তিনি কিছুই দেননি ফেলে। মানুষের একটি মাত্র যাপনযোগ্য পার্থিব জীবন; সে জীবনের আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, দুঃখ-তাপ সবই তাঁর কাছে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ। মানবিক এই জীবনকেই তিনি শৈল্পিক সুষমায় মেলে ধরেছেন সাহিত্য-সংগীত-নাট্যকলা-চিত্রকলায়। তবু সব পরিচয় ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে তাঁর কবি-পরিচয়। জীবনবাদী কবি তিনি, দুনিয়াজোড়া মানুষের কবি, মানবতার কবি।

রবীন্দ্রনাথকে রোমান্টিক কবি বলা হয় বটে, তবে তাঁর রোমান্টিকতার রূপ-রস-গন্ধ খানিকটা ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর রোমান্টিকতা কেবল আকাশবিহারী কল্পনামাত্র নয়, 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি'ও তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। অপার্থিব প্রেম ও সৌন্দর্যধ্যান কবিকে নিয়ে গেছে উচ্চ স্তরের কল্পলোকে, আবার মাতৃভূমির সুখ-দুঃখকাতর মানুষের প্রতিও তিনি নিবিড় আত্মীয়তার টান অনুভব করেছেন কবিজীবনের গোড়া থেকেই, 'এবার ফিরাও মোরে' বলে আকুলতাও ব্যক্ত করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যে সাধারণ মানুষের জন্যে গভীর মমতামাখা এবং সম্মানজনক স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে উজ্জ্বল বর্ণে, এ কথা অস্বীকারের উপায় নেই। মৃত্যুকে ভ্রুকুটি হেনে 'মানবের মাঝে' বেঁচে থাকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন, সে 'মানব' সাধারণ মানুষই বটে। সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন যে জীবন সে জীবনে কবির স্বস্তি নেই, আনন্দ নেই। পিতৃনির্দেশে জমিদারি তদারক করতে এসে নদীবিধৌত পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) মানুষের অতি সাধারণ নিস্তরঙ্গ জীবনের নৈমিত্তিক ছবি তাঁর কবিমানসে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে এবং জীবনের অন্তিমবেলা পর্যন্ত তিনি সাধারণ মানুষের অনাড়ম্বর জীবনের সেই ছবি মোটেই বিস্মৃত হননি, দৃশ্যাতীত সেই ছবির মানুষের কথাও কখনো ভুলে যাননি। 'আমি তোমাদেরই লোক' বলে কবি নিজের নামটিকে সাধারণ মানুষের পঙ্‌ক্তিভুক্ত করার বাসনা প্রকাশ করেছেন অকপটে। তাই তিনি এই সাধারণ মানুষের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লেখেন :

'চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল–
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।'
(জন্মদিনে : ১০ সংখ্যক কবিতা)

এই উপলব্ধি থেকেই কবি শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছেন এবং নিবিড় আত্মীয়তা বোধ করেছেন। তাদের বেদনায় ও অপমানে তিনি একাত্ম হয়ে বলেছেন :

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান;
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

মানুষের এই অপমান কবির বুকে প্রচণ্ড বেজেছে। তাই স্পষ্ট আহ্বান জানিয়েছেন :

'...এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা– এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা– ডাকিয়া বলিতে হবে–
'মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে, ...'
(এবার ফিরাও মোরে : চিত্রা)

দীর্ঘ কাব্য-পরিক্রমার বিভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ গভীর আন্তরিকতায় সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা এবং ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা লিখেই দায়িত্ব শেষ করেননি, বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে তিনি টের পেয়েছেন 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস', তাই তথাকথিত 'শান্তির ললিত বাণী' শোনাবার পরিবর্তে অনাগত কালের মৃত্তিকালগ্ন কবিকে আহ্বান জানিয়েছেন :

'কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।'
(জন্মদিনে : ঐক্যতান)

স্বদেশপ্রেম রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যুক্ত করেছে। নিজের দেশকে মাতৃভাবে গ্রহণ করা এবং ভক্তিভরে স্মরণ করার শিক্ষা তিনি শৈশবেই পারিবারিকভাবে লাভ করেন। প্রকৃতিপ্রেমিক কবি বাংলা মায়ের বৈচিত্র্যময় রূপ ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়েছেন, আকণ্ঠ পান করেছেন তার রূপসুধা; বারবার তাঁর কবিতা ও গানে গানে সেই রূপের বর্ণনা দিয়েছেন বিচিত্র রঙে ও রেখায়। রানির মতো ধনরত্ন বাংলা মায়ের আছে কি না, সে হিসাব মেলাতে চাননি কবি। বরং তিনি সগৌরবে ঘোষণা করেন– 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।' তবে তাঁর এই স্বদেশভাবনা কখনোই উগ্র জাতীয়তাবাদকে অনুমোদনও করেনি, প্রশ্রয়ও দেয়নি। তাঁর কবিতায় স্বদেশের রূপ শান্ত, ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল, মমতায় মাতৃমূর্তি, সাম্যের প্রভাবে উদার। স্বদেশমাতার এই উদার আকাশ এবং নির্মল বাতাস চিরদিন কবির প্রাণে 'বাজায় বাঁশি'। তাই তো তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন– 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' বটের মূলে কিংবা নদীর কূলে কূলে আঁচল বিছিয়ে দেওয়ার যে ছবিটি কবি এঁকেছেন, তার শোভা-ছায়া-স্নেহ-মায়া সবকিছু তো মমতাময়ী মাকেই মনে করিয়ে দেয়। কবি দেশের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে হৃদয়ের প্রণতি জানাতে গিয়ে দেশমাতার আদলের মধ্যেই খুঁজে পান বিশ্বমাতাকে। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ যতখানি জাতীয়তাবাদী তারও অধিক আন্তর্জাতিকতাবাদী। নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দল বা মতাদর্শে তিনি হয়তো আস্থাশীল ছিলেন না, কিন্তু মানবতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শান্তি-স্বাধীনতা-গণতন্ত্র, পারস্পরিক মৈত্রী ও সহাবস্থান, মানবিক মুক্তি ও মঙ্গলবোধ ইত্যাদি বহুকৌণিক পর্যবেক্ষণে তিনি ছিলেন যথার্থই আন্তর্জাতিকতাবাদী। সমকালীন বিশ্বরাজনীতির স্পন্দনে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিমানস এবং কবিমানস হয়েছে স্পন্দিত। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ছোবল এবং ফ্যাসিবাদের নগ্ন ও বীভৎস চেহারা কবি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেছেন তাঁর শেষ জীবনের একাধিক কাব্যে। তারই একটিতে কবি বলেন :

রবীন্দ্রনাথকে রোমান্টিক কবি বলা হয় বটে, তবে তাঁর রোমান্টিকতার রূপ-রস-গন্ধ খানিকটা ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর রোমান্টিকতা কেবল আকাশবিহারী কল্পনামাত্র নয়, 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি'ও তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে

'বিশ্ব জুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে
অন্ধ বেগে ঝঞ্ঝাবায়ু হুংকারিয়া আসে
ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া।'
(নবজাতক : আহ্বান)

রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চিন্তার ফসল। জীবনের শেষ বেলা পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। ভূমিহারা, বাস্তুহারা উপেনের হাহাকার যেমন তাঁকে ব্যথিত করেছে, তেমনি সভ্যতাগর্বী মানুষের হাতে সম্ভ্রমহারা আফ্রিকার আর্তচিৎকার তাঁকে সংক্ষুব্ধ করেছে, প্রতিবাদী করেছে। শেষ জীবনের বহু কবিতায় পাওয়া যায় মানবতার অপমানে ক্ষুব্ধ কবির তীব্র প্রতিবাদ এবং তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রুপ। পত্রপুটের সতেরোসংখ্যক কবিতায় (কবিতার নাম : বুদ্ধংশরণং গচ্ছামি) কবির মর্মভেদী বিদ্রুপ ও ক্ষোভ চমৎকার বাণীরূপ পেয়েছে। ওই কবিতায় দেখা যাচ্ছে– সাম্রাজ্যলোলুপ, সভ্যতাবিধ্বংসী জাপানি সৈনিকেরা চলেছে চীনা জনপদ আক্রমণ এবং দখল করতে। শুধু রাজ্যজয়ই ওদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, বর্বর সৈনিকেরা মানবতার লেশমাত্র অবশিষ্ট রাখবে না, যা কিছু সুন্দর শুভ কল্যাণময় সবই তারা নিঃশেষে ধ্বংস করবে বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; তাই তারা সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়। জগতে অহিংসার মহৎ বাণী ছড়িয়ে গেছেন যে মহামানব দয়াময় বুদ্ধ, তাঁরই আশীর্বাদ নিয়ে হিংসায় উন্মত্ত হয়ে তারা 'বিষ মিশিয়ে দিতে চায় নিঃশ্বাসে'। প্রহসন আর বলে কাকে? তারা 'ছিঁড়ে ফেলবে ঘরে ঘরে ভালোবাসার বাঁধনসূত্র' এবং–

'পিশাচের অট্টহাসি জাগিয়ে তুলবে
শিশু আর নারীদেহের ছেঁড়া টুকরোর ছড়াছড়িতে।'

বর্বর এই ফ্যাসিস্ট বাহিনী চাইছে বুদ্ধের আশীর্বাদ! বৈপরীত্য কিংবা পরিহাস আর বলে কাকে! মানবতার এই অপমানে কবির অন্তরে জমেছে বিক্ষোভের বুদ্‌বুদ। মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও গভীর ভালোবাসা রবীন্দ্রনাথকে করেছে প্রবল সংবেদনশীল এবং মানবতাবাদী। মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তিনি আজীবন জড়িয়ে নিয়েছিলেন মানবাধিকারের প্রশ্নটিকেও। জীবনের শেষ অধ্যায়ে, যখন পৃথিবী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রক্তক্ষত পুরোপুরি মুছতে পারেনি অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রবেশ করতে বাধ্য হচ্ছে, দুনিয়াব্যাপী টালমাটাল সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই উৎকণ্ঠায় উৎকর্ণ হয়ে

থাকতেন, পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে মানবতার অপমানে তিনি বেদনার্ত হয়ে উঠতেন, ক্ষুব্ধ হতেন, প্রতিবাদ জানাতেন। জনতার আন্দোলন-সংগ্রাম-বিক্ষোভে কখনো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, আবার কখনো লেখনীর মাধ্যমে আত্মিক সমর্থন-সংহতি ঘোষণা করেছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ এবং ১৯১৯ সালে হিজলী ও চট্টগ্রামের কারাগারে রাজবন্দিদের ওপরে অমানুষিক নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আয়োজিত জনসভায় সত্তরোর্ধ্ব বয়সের ভার ও ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কবি সশরীরে উপস্থিত হন, ইংরেজ শাসকদের প্রতি নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে তিনি লিখিত ভাষণ দেন। অবমানিত মনুষ্যত্বই রবীন্দ্রবিবেকে নাড়া জাগিয়েছে সারা জীবন, প্রাণের গভীর থেকে সাড়া দিয়েছেন বিশ্বমানবতার আহ্বানে; সংহতি প্রকাশ করেছেন সব দেশের, সব কালের অধিকারবঞ্চিত মানুষের লড়াই সংগ্রামে। অতিশয় দুঃখের বিষয় হচ্ছে– বিশ্বমানবতার পক্ষে উচ্চকণ্ঠ এই রবীন্দ্রনাথকে এখনো পণ্ডিতদের অনেকের আলোচনায় উপনিষদের ভাবরসে পুষ্ট ঋষি 'সন্তের আবরণে' আড়াল করতেই দেখা যায়। তাঁদের মতে, উপনিষদের ভাবরসে পুষ্ট ঋষি রবীন্দ্রনাথ যেন-বা সেই 'সন্তের আবরণ' থেকে বেরিয়ে আসতেই পারেন না। অথচ রবীন্দ্রনাথ কখনোই 'বৈরাগ্য সাধনে' মুক্তি খোঁজেননি, মুক্তি খুঁজেছেন 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে'; দুঃখের কাঁটায় রক্তাক্ত পথ পেরিয়ে তিনি পেতে চেয়েছেন আনন্দময় মুক্তি। এই কি ঋষি রবীন্দ্রনাথের পরিচয়?

ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ আচারসর্বস্ব প্রচলিত কোনো ধর্মমতের অন্ধ অনুসারী ছিলেন না। ঋষি পিতার ঔদার্য হয়তো তাঁর মানস গঠনে প্রভাব ফেলতে পারে। মূলত তিনি ছিলেন প্রবলভাবে মানবতাবাদী। জাতিধর্মের ভেদরেখার অনেক ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি। পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) এসে বাংলার লোকায়ত জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, যা তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনায় যোগ করে নতুন মাত্রা। সেই সঙ্গে এই বাংলাতেই তিনি সন্ধান পান বাউল দর্শনের, যা তাঁর মানবিক মূল্যবোধে এনে দেয় অসামান্য দীপ্তি। উপনিষদের আনন্দবাদী দর্শনও তাঁকে দিয়েছে সর্বজনীন মানবিকতাবোধের অন্তর্দৃষ্টি। এই সব মিলিয়েই কবি রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ, বাঙালি রবীন্দ্রনাথ এবং সর্বোপরি মানুষ রবীন্দ্রনাথ। অথচ আজও অনেকে 'সন্তের আবরণ' থেকে মুক্ত করতে চান না এই 'মানুষ রবীন্দ্রনাথ' বা 'ব্রাত্যজনের রবীন্দ্রনাথ'কে। সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে আলখাল্লার বাইরের রবীন্দ্রনাথকে জানার জন্য। রবীন্দ্রনাথ নিজেই উপনিষদের মায়াবাদী দর্শনের সোনার খাঁচায় বন্দি থাকতে কিংবা কেবল শান্তিনিকেতনের 'গুরুদেব' হয়ে থাকতে চাননি। এসব বৃত্ত ভেঙে তিনি পরিণত বয়সে এসে নিজেকে পঙ্‌ক্তিহারা ব্রাত্যজন বলে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন :

'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে মানবলোকে
আকাশের জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরঙ্গ আনন্দে।'

পূর্ববঙ্গের বাউল-সান্নিধ্য এবং নদী সন্নিহিত সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবনের পরিচয় লাভের মধ্য দিয়ে অভিজাত ঠাকুরবাড়ির সন্তান রবীন্দ্রনাথের যেন-বা নবজন্ম ঘটে। পূর্ববঙ্গ তথা এই বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস, জল-হাওয়া, বুঝি-বা তাঁকে করে তোলে সর্বমানবের কবি, ব্রাত্যজনের কবি এবং এই ভূভাগে দাঁড়িয়ে আমরা দাবি করতেই পারি– তিনি আমাদের কবি।

লেখক : কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ

myGov
এক ঠিকানায় সরকারি সেবা

বেতার বাংলা গ্রাহক সেবা

সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য

সেবার ফি

* প্রতি কপি বইয়ের মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাসুলসহ)
* বাৎসরিক বান্ডল ১৮০ টাকা

সেবা প্রদানের সময়সীমা

৭ কার্যদিবস

আবেদন ফরম পূরণের নিয়মাবলি

১. আবেদন ফরমের লাল তারকা (*) চিহ্নিত ঘরগুলো অবশ্যই পূরণ করুন। অন্যান্য ঘর পূরণ করা ঐচ্ছিক।
২. আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে প্রয়োজন হলে সংরক্ষণ করা যাবে এবং পরবর্তীতে সেবা ব্যবস্থাপনা অপশন হতে ড্রাফট আবেদন পুনরায় শুরু করা যাবে।
৩. আবেদন দাখিলের পর প্রতিটি আবেদনের জন্য একটা স্বতন্ত্র ট্র্যাকিং নম্বর প্রদান করা হবে যেটি ব্যবহার করে সেবা ব্যবস্থাপনা অপশন হতে আবেদনের অগ্রগতি জানা যাবে।

সেবাটি পেতে প্রবেশ করুন এই লিংকে: https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1712031489

- এছাড়াও গ্রাহক হওয়ার জন্য সরাসরি/ ডাকযোগে/ ইমেইলে আবেদন (মোবাইল নম্বরসহ) পাঠাতে পারেন।
- আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: বরাবর, আঞ্চলিক পরিচালক, বেতার প্রকাশনা দপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ই-মেইল: betarbanglabd@gmail.com

বৃষ্টি মাতাল মধ্যরাতে

মনসুর আজিজ

বৃষ্টি মাতাল মধ্যরাতে জোয়ার ওঠে মনে
ঝড়-বাদলের এমন দিনে কী করি যে একা
বিজলি চমক দিলে তো পাই কদম কেয়ার দেখা
এমন দিনে তোমায় স্মরণ করি ক্ষণে ক্ষণে।

নদীর বুকে জোয়ার এলে হাসে নদীর কূল
চাষির চোখে স্বপ্ন জাগে ফসল বোনার সুখ
আবেগ যেন ছলকে ওঠে আশা বাঁধে বুক
মানব মনে জোয়ার এলে ফোটে প্রেমের ফুল।

বর্ষা রাতে ফরসা আকাশ হঠাৎ দেখা যায়
তারার আলো বধূর নথে একটু ঝিলিক মারে
চোখের তারায় সুখের আদর পলক ফেলে আড়ে
এমন প্রেমের সুখের নীড়ে বৃষ্টি অসহায়।

তুমুল বেগে মানব মেঘে বৃষ্টি নামুক তবে
বর্ষারাতে নতুন সুরে প্রেমের গানও হবে।

বিলের ভিতর ঘর

তপন বাগচী

জলির বিলের জলে ডুবে আছে
পুরোনো উঠান।
রাতের গভীরে নাকি ফসফিন জ্বলে।
কেউ বলে দূরের ভূতের আলো।
কেউ বলে, বহু আগে এক জেলে
বউকে পুতির মালা কিনে দিতে গিয়ে
ফিরে যে আসেনি, তার অভিমান!

এখন মাঝরাতে
একটা টাপুরে নৌকা ভেসে ওঠে।
তার বইঠা নেই,
তবু ঘুরপাক খায় শাপলার ভিতর।

আমি একবার দেখেছি দুচোখে
ডোবার সমূহ জলে একটি পুরোনো মুখ,
যে আমাকে দেখে মুখ টিপে হাসছিল।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মহররমের শিক্ষা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মোঃ ওমর ফারুক

আরবি নববর্ষের প্রথম মাস মহররম। নতুন বছরের শুরু মানুষের মনে নতুন মেসেজ দেয়। প্রতিটি মানুষের মনে নতুন কিছু পাওয়ার আগ্রহ, নতুন বার্তা বয়ে আনে। নতুনভাবে চিন্তাভাবনার তাগিদ সৃষ্টি করে। মানবতা, মনুষ্যত্বের কল্যাণে মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর অভিনব সৃষ্টিকুলকে সুন্দর ও অনুপম ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার জন্য দিন সময় মাস ও বছর গণনার সুবিধা করে দিয়েছেন। যেন প্রাত্যহিক কাজকর্মগুলো সঠিক সময়ে সম্পাদন করা যায়। আরবি নববর্ষের প্রথম মাস মহররম। এই মাস মুসলিম উম্মাহর কাছে নতুন বার্তা বয়ে আনে। খোলাফায়ে রাশেদার অন্যতম সিংহপুরুষ জিন্নুরাইন হজরত ওসমান (রা.)-এর সময়কাল থেকে হিজরি সনের প্রথম মাস হিসেবে মহররম মাস ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করে।

মানবজাতির ওপর বিশেষ নিয়ামত হিসেবে আল্লাহতায়ালা ১২টি মাসের মাধ্যমে বছরের দিনগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তন্মধ্যে মহররম হচ্ছে আরবি বর্ষের প্রথম মাস। চারটি মাসে যুদ্ধবিগ্রহ হারাম করা হয়েছে। তার মধ্যে মহররম হচ্ছে অন্যতম। মহররম মাসের ১০ তারিখকে আশুরার দিন বলা হয়। অনেকে আশুরার দিন হিসেবে পালন করে। মুসলিম উম্মার নিকট বিশেষ কয়েকটি কারণে এই দিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবী সৃষ্টি হতে শুরু করে শেষ নবি মুহম্মদ (স.)-এর সময় পর্যন্ত এই দিনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। তন্মধ্যে হজরত মুসা আলাইহিস সালামের কাওমের মুক্তি, নীল নদে ফেরাউন সম্প্রদায়ের ধ্বংস, কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেন-ইমাম হাসানের শাহাদতবরণ, হজরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম, হজরত আদম (আ.)-এর তওবা

কবুলের ঘটনা, হজরত ইউনুস নবির মাছের পেট থেকে মুক্তি, হজরত আদম (আ.) ও বিবি হাওয়ার আরাফাতে মিলিত হওয়া অন্যতম। এছাড়া আল্লাহতায়ালা এই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং পৃথিবী ধ্বংস তথা কেয়ামত সংঘটিত হবে এই মহররম মাসে।

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মহররম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহতায়ালা উল্লেখ করেন নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে গণনার মাস বারোটি। তার মধ্যে চারটি সম্মানিত মাস (সুরা তওবা, আয়াত ৩৬)। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, রমজানের পর সর্বোত্তম রোজা হলো মহররমের রোজা (সহিহ মুসলিম)। অপর হাদিসে আছে– মহররম হচ্ছে শাহরুল্লাহ বা আল্লাহর মাস।

এই মাসের ১০ তারিখকে আশুরার দিন বলা হয়। রসুল (স.) মদিনায় গমন করার পর দেখতে পেলেন ইহুদিরা এই দিনে রোজা রাখে। তখন তিনি জানতে চাইলেন কেন তোমরা এই দিনে রোজা রাখো? তারা জবাবে বলেন, আল্লাহতায়ালা এই দিনে মুসা ও তার অনুসারীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। তখন রসুল (স.) বলেন, মুসা নবির ব্যাপারে আমরা অধিকতর হকদার। অতঃপর তিনি নিজে রোজা পালন করেন এবং সাহাবিদের রোজা পালন করার নির্দেশ দেন।

চারটি মাসে যুদ্ধবিগ্রহ হারাম করা হয়েছে। তার মধ্য মহররম হচ্ছে অন্যতম। মহররম মাসের ১০ তারিখকে আশুরার দিন বলা হয়। অনেকে আশুরার দিন হিসেবে পালন করে। মুসলিম উম্মার নিকট বিশেষ কয়েকটি কারণে এই দিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবী সৃষ্টি হতে শুরু করে শেষ নবি মুহম্মদ (স.)-এর সময় পর্যন্ত এই দিনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে...

কারবালার ঐতিহাসিক ঘটনা

মহরম মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহুগুণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এই মাসে। রসুল (স.)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজের জীবন উৎসর্গ করে শাহাদত বরণ করেন। কারবালার প্রসিদ্ধ ঘটনা থেকে কী শিক্ষা আমরা লাভ করতে পারি? সত্য ও ন্যায়ের পথে জীবন দিয়ে হলেও লড়াই করে যেতে হবে। জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ক্ষমতার মোহে নয় বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকে আজীবন সংগ্রাম করতে হবে। পার্থিব কোনো স্বার্থ হাসিলের জন্য নয় বরং খোদ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে প্রয়োজনে শাহাদাত বরণ করতে হবে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মহররমের প্রয়োজনীয়তা

সত্য-ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-সংগ্রাম কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। একদল মানুষ সত্য কায়েমের সংগ্রামকে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানাবে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যায়, জুলুম, নির্যাতনের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান বজায় রাখা জরুরি। আজও সমাজে দুর্নীতি চোরাকারবারি বন্ধ হয়ে যায়নি, সুদ, ঘুষ, মিথ্যা, পণ্যে ভেজাল সমাজকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে। এর বিরুদ্ধে অবশ্যই ভূমিকা রাখতে সচেতন মহলকে সোচ্চার হতে হবে। নতুন বছরের প্রথম মাসের শুরুতে বিগত বছরের পর্যালোচনা করে নিজেকে সংশোধন ও পরিমার্জিত করে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ নেওয়া সচেতন মুসলিম নাগরিকের দায়িত্ব।

শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির অনন্য উপাদান হচ্ছে ঐক্য ও সাম্যকে প্রাধান্য দেওয়া। মহররম মাস সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যের অবস্থান সাম্যের বার্তা দেয়। মুসলিম উম্মাহর আসল শক্তি ও মুক্তির উপাদান ঐক্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে। ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা আন্তরিকতার মধ্যে বিদ্যমান।

কারবালার সংগ্রাম একক কোনো ব্যক্তি-পরিবারকে রক্ষা করার আন্দোলন ছিল না। কাউকে ক্ষমতাচ্যুত করে অন্য কাউকে ক্ষমতার মসনদে বসানোর আন্দোলন ছিল না বরং এটা ছিল ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জ্বলন্ত সংগ্রাম।

ইসলাম শুধু একটি ধর্মের নাম নয়। ইসলামে আছে নারী শিশু এতিম অনাথ ও দুস্থদের শতভাগ অধিকার প্রতিষ্ঠার বাস্তব চিত্র। সমাজে নারী শিশু এতিমদের অধিকার যেন ক্ষুণ্ন না হয় সেজন্য ইসলাম তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করেছে– মহররম তারই জীবন্ত উদাহরণ।

একজন ইমানদার কখনো একত্ববাদ বাদ দিয়ে, রবের বিধিবিধান তোয়াক্কা না করে, মনগড়া জিন্দেগিকে প্রাধান্য দিতে পারে না। কুরআনিক ফর্মুলা বাদ দিয়ে পরিবার ও সমাজ বা রাষ্ট্রীয় কোনো সুবিধাভোগের বিনিময়ে সত্যিকারের আদর্শ মুসলিম এক ইঞ্চি সরতে পারে না, যা ঘটেছিল ইমাম হোসেনের কারবালার সংগ্রাম এর বাস্তব চিত্র। ইমাম হোসেনের কুরআনিক ফর্মুলাকে আদর্শ নীতি হিসেবে গ্রহণ করা আর ইয়াজিদের মনগড়া খাহেসাত পূরণ করা খেলাফতের আদর্শকে পদদলিত করার নামান্তর। সেজন্যই ইমাম হোসেন ছিলেন অনড়, অবিচল যা আজও আমাদেরকে সত্যের পথে অনড় অবিচল থাকতে পথ দেখায়, সাহস জোগায় উৎসাহ অনুপ্রাণিত করে।

মহররমে ইমানদারগণ নবিজির সুন্নত হিসেবে আশুরার রোজা পালন করে থাকেন। বিগত বছরের জীবনের হালখাতা করে অধিক পরিমাণ তাওবা ইস্তেগফার বলা, ভালো কাজগুলোর জন্য শুকরিয়া আদায় করা, দান-সাদাকা বৃদ্ধি করা, অন্যায়, অবিচার ও সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে অবিচল থাকা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মুসলিমগণ পরিবার ও সমাজে ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কাজ ত্বরান্বিত করতে পারেন। আশুরার সত্যিকারের শিক্ষা পালনের মাধ্যমে ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই বর্তমান সময়ের দাবি।

লেখক : ইসলামি চিন্তাবিদ ও লেখক

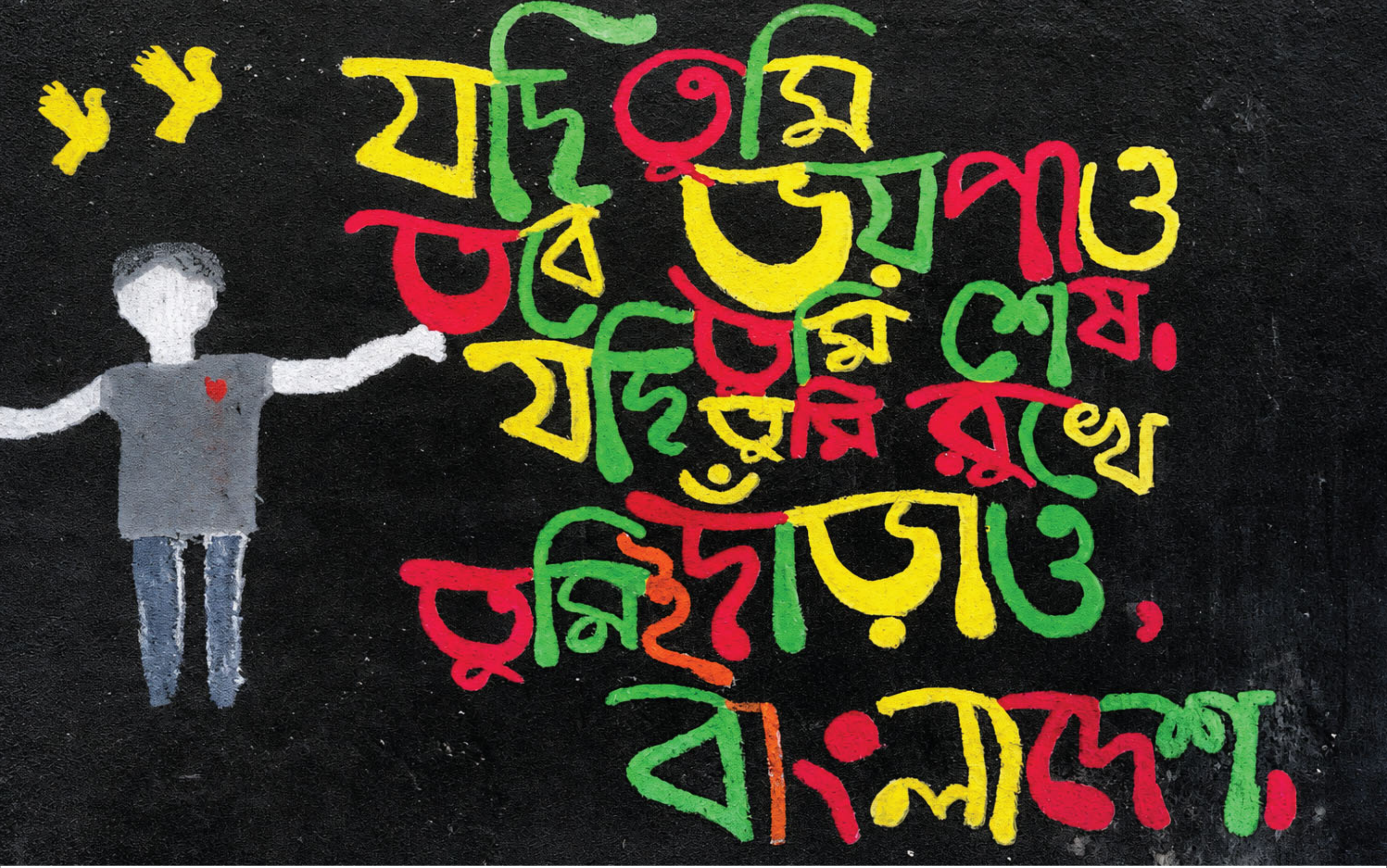

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, কর্তৃত্ববাদী শাসনের পতন ও উজ্জ্বল আশাবাদ

সৈয়দ তোশারফ আলী

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বরাবর গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে বিবর্তিত হয়েছে। অন্তত আমার নিজের দেখা গত কয়েক দশক ধরে এই রাষ্ট্রের কাঠামোগত স্থিতিস্থাপকতার পরীক্ষা কোনো আইনসভা বা আদালতের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে হয়নি, বরং হয়েছে রাজপথের উত্তাল, সংক্ষুব্ধ ও রক্তরঞ্জিত চত্বরে। ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানও সেই চিরচেনা ঐতিহ্যের এক স্মরণীয় বিস্তার।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য পুনর্বহালকৃত ৩০ শতাংশ কোটাব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ শিক্ষার্থীদের এক অহিংস প্রতিবাদ অতি দ্রুত অভাবনীয় এক গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিয়ে বসে। ২০২৪-এর ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার একটানা ১৫ বছরের কঠিন স্বৈরশাসনের পতন ঘটে এবং দেশ এক নতুন ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন অধ্যায়ে প্রবেশ করে।

ড. মো. ইউনূসের নেতৃত্বে পরিচালিত সেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিরলস চেষ্টায় ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে দেশ নির্বাচনি গন্তব্যে এসে পৌঁছায়। দেশের ত্রয়োদশ জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বহুকাঙ্ক্ষিত নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। দলটির ওপর দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হয়। এই নির্বাচনি বিজয় কেবল কয়েক দশকের তিক্ত পারিবারিক রাজনৈতিক দ্বৈরথের অবসানই ঘটায়নি, বরং তারেক রহমানকে দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিষিক্ত করেছে। আজ জনগণের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত নতুন সরকারের অধীনে বাংলাদেশ যখন তার ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক কাঠামোকে নতুন করে সাজাচ্ছে, তখন একজন প্রবীণ সাংবাদিক হিসেবে অতীতের দিকে তাকিয়ে এই ঘটনার একটি নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করার তাগিদ অনুভব করছি। এই ঘটনাপ্রবাহকে বুঝতে হলে অতীতের ঐতিহাসিক ছাত্র আন্দোলনগুলোর সঙ্গে এর যোগসূত্র খুঁজে বের করতে হবে। নিরূপণ করতে হবে এর পেছনে চুকানো চড়া মানবিক মূল্য এবং সুনির্দিষ্ট করতে হবে নতুন বিএনপি সরকারের সামনে থাকা সেই প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের এজেন্ডা, যা এই গণ-অভ্যুত্থানের মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল।

প্রতিরোধের পরম্পরা

ইতিহাস কীভাবে জুলাই আন্দোলন এবং এর পরবর্তী নির্বাচনি ফলাফলকে বিচার করবে, তা বুঝতে হলে আমাদের একটি ভ্রান্ত

বিশ্লেষণাত্মক ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। এটিকে কেবলই 'তরুণদের সাময়িক ক্ষোভের বিস্ফোরণ' হিসেবে দেখলে ভুল হবে। বরং, এই অভ্যুত্থান হলো আমাদের দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রতিরোধের ধারাবাহিকতারই এক অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ। স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে এ দেশের ছাত্রসমাজের নেতৃত্বাধীন প্রতিরোধের রয়েছে এক গৌরবময় ইতিহাস । ২০২৪-এর জুলাই আন্দোলনের রাজনৈতিক ও কৌশলগত কাঠামো মূলত তিনটি বড় ঐতিহাসিক অধ্যায়েরই আধুনিক রূপান্তর : ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন।

সামরিক একনায়ক আইয়ুব খানের 'শরিফ কমিশন'-এর গণবিরোধী সুপারিশের বিরুদ্ধে ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন ছিল মূলত রাষ্ট্র-আরোপিত বর্জনের নীতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক আদর্শিক লড়াই। সেই কমিশন আর্থিক ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাকে কেবল বিত্তবান শ্রেণির জন্য সীমিত করতে চেয়েছিল। ১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সামরিক জান্তার রক্তচক্ষু আর রাষ্ট্রীয় কারফিউ উপেক্ষা করে ছাত্রসমাজ যখন রাজপথে নেমে আসে, তখন তারা এ দেশের ইতিহাসে এক অমোঘ বার্তা খোদাই করে দিয়ে যায় যে জনগণের সামাজিক গতিশীলতাকে রুদ্ধ করে, এমন যেকোনো বৈষম্যমূলক নীতিকে এই রাজপথেই বাতিল করা হবে। ঠিক একইভাবে, ২০২৪ সালে কোটা ব্যবস্থার পুনর্বহাল ছিল ঠিক তেমন একটি বৈষম্যমূলক বর্জনেরই এক অভিনব সংস্করণ। সিভিল সার্ভিসের সিংহভাগ পদ একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বলয়ের জন্য সংরক্ষিত করে সরকার কার্যত একটি পুরো মেধাবী প্রজন্মকে বেঁচে থাকার ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিল। ১৯৬২ সালের সেই আদর্শিক স্ফুলিঙ্গ, অর্থাৎ অনুগতদের সুবিধা দেওয়ার জন্য তৈরি রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান, ঠিক সেই একই রকমের বিস্ফোরক হিসেবে কাজ করেছিল, যা ২০২৪-এর গ্রীষ্মে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রংপুরের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে বিস্ফোরিত হয়।

১৯৬২ সাল যেখানে আমাদের আদর্শিক ভিত্তি দিয়েছিল, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান সেখানে পদ্ধতিগত পতনের কাঠামোগত নকশা তৈরি করতে শিখিয়েছিল। '৬৯-এর আন্দোলন প্রমাণ করেছিল যে, বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগামী ছাত্রসমাজ একা কোনো শক্তিশালী সামরিক বা স্বৈরাচারী শাসককে হটাতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের দাবি সাধারণ মানুষের তীব্র আর্থসামাজিক হতাশার সঙ্গে এক সুতোয় গ্রথিত না হয়। সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচি সাধারণ মানুষের মন ছুঁয়েছিল, কারণ তা অভিজাতদের রাজনৈতিক চাহিদার সঙ্গে শ্রমিক-কৃষকের বাঁচার দাবিকে যুক্ত করেছিল। ২০২৪ এর জুলাই আন্দোলনও ঠিক একই পথেই এগিয়েছে। অনুগত পুলিশ ও দলীয় ছাত্রসংগঠনের পেটুয়া বাহিনী যখন ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা চালানো শুরু করল, আন্দোলন তখন কোটার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নিল। অর্থাৎ আন্দোলনের গতিমুখ বদলে গেল। আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন ঘটল তখন, যখন শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণি, অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, রিকশাচালক এবং তৈরি পোশাক কারখানার হাজার হাজার শ্রমিক ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

১৯৯০ সালের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন আমাদের শিখিয়েছিল রাজপথের আন্দোলনকে কীভাবে ব্যালট বাক্সে প্রতিফলিত করতে হয়। জেনারেল এরশাদ প্রায় এক দশক ধরে বিরোধী দলগুলোকে টুকরো টুকরো করে এবং নির্বাচনকে তামাশায় পরিণত করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। কিন্তু ১৯৯০-এর শেষভাগে 'সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য' দেশের বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলোকে এক টেবিলে বসতে বাধ্য করে এবং আন্দোলনে এরশাদের পতনের পর চালু হয় নির্বাচনকালীন 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা। ২০২৪-র জুলাই আন্দোলনও জন্ম নিয়েছিল দীর্ঘদিনের নির্বাচনি অধিকার হরণের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে। ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪-এর শুরুতে হওয়া প্রহসনের নির্বাচনে এ দেশের তরুণ ভোটারদের একটা বড় অংশ কখনো ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়নি। কারণ, ভোটারদের ভোট ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্বাচন। তবে, ১৯৯০ সালের আন্দোলন যেখানে কেবল একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার ওপর জোর দিয়েছিল, ২০২৪ এর গণজাগরণ তার চেয়েও বহুদূর এগিয়ে সমগ্র সাংবিধানিক ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমূল রূপান্তরের দাবি জানায়, যা শেষ পর্যন্ত ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের পথ সুগম করে।

ত্যাগের খতিয়ান : অভ্যুত্থানের পরিসংখ্যানগত বাস্তবতা

ইতিহাসের পাতায় জুলাই আন্দোলনের স্থান নির্ধারিত হবে একে সফল করে তুলতে যারা শহিদ হয়েছেন তাদের আত্মত্যাগের খতিয়ান দিয়ে। আজকের নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা কোনো ড্রয়িংরুমের সমঝোতা বা এলিটদের আলোচনার মাধ্যমে হয়নি, হয়েছে রাজপথে আপামর জনতার সাহস, সংগ্রাম ও জীবন কুরবানির বিনিময়ে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের সত্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন স্বাধীন মানবাধিকার সংস্থার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই আন্দোলনে মানুষের হতাহতের যে ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে, তা এ দেশের শান্তিকালীন ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মর্মান্তিক ঘটনা।

সরকারি দলের অনুগত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দমন-পীড়নের মারাত্মক রূপ এখন আর অস্পষ্ট নেই, দিবালোকের মতো স্পষ্ট। আন্দোলনের সময় নিহত আনুমানিক ১,৪০০ জনের বিশাল অংশের মৃত্যুর কারণ ছিল বেসামরিক সমাবেশের ওপর আগ্নেয়াস্ত্রের নির্মম ব্যবহার। হতাহতদের বয়স ও পেশাগত বিন্যাস স্পষ্ট করে দেয় যে এটি ছিল মূলত তরুণ ও ছাত্র-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন। নথিবদ্ধ নিহতদের মধ্যে ৫১.১ শতাংশ ছিলেন সাধারণ শিক্ষার্থী, যারা বুক পেতে আন্দোলনের সম্মুখভাগ আগলে রেখেছিলেন।

সবচেয়ে নির্মম ও হৃদয়বিদারক সত্য হলো, এই হত্যাযজ্ঞে ঝরে যাওয়া প্রাণগুলোর প্রায় ১২.৫ শতাংশই ছিল অবুঝ শিশু এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর। এই ভয়াবহ পরিসংখ্যান দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করে যে, তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের অনুগত বাহিনীর হামলা কেবল রাজপথেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; তা সাধারণ মানুষের ঘরের জানালা, বারান্দা ও নিরাপদ আবাসিক এলাকার ভেতরেও প্রাণঘাতী ছিল।

টানা তিন সপ্তাহের অমানবিক তাণ্ডবে ১১,৭০০-এরও বেশি মানুষকে নির্বিচারে গ্রেফতার ও কারাবন্দি করা হয়, যা গোটা দেশকে যেন একটি শ্বাসরুদ্ধকর কারাগারে পরিণত করেছিল। এই পরিসংখ্যানগুলো কেবল নিছক কোনো সংখ্যা নয়; এগুলো

এ দেশের তরুণদের বুকের রক্ত আর নজিরবিহীন সাহসের আগুনে যে নতুন বাংলাদেশের নকশা খোদাই করা হয়েছে, তা কখনোই ব্যর্থ হতে পারে না। বিশ্ব আজ বাংলাদেশের এক সত্যিকারের, চূড়ান্ত ও ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার উদয় দেখছে

আমাদের নতুন প্রজাতন্ত্রের রক্তে লেখা এক অলিখিত নৈতিক দলিল। এটি এমন এক অলঙ্ঘনীয় মানদণ্ড, যার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আগামী দিনের প্রতিটি শাসনব্যবস্থাকে আবশ্যিকভাবে জবাবদিহি করতে হবে যেন এমন দুঃশাসনের পুনরাবৃত্তি এ মাটিতে আর কখনো না ঘটে।

ক্ষমতার নতুন ম্যান্ডেট

২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি কোটি কোটি ভোটারের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিযোগিতাপূর্ণ সাধারণ নির্বাচন। দীর্ঘদিনের ভোটারবিহীন নির্বাচনের খরা কাটিয়ে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল প্রায় ৫৭ শতাংশ। গণতন্ত্রের সপক্ষে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া ঘরে-বাইরে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। নির্বাচনে ২৯৭টি সংসদীয় আসনের মধ্যে ২০৯টিতে জয়লাভ করে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। এ এক ঐতিহাসিক ভূমিধস বিজয়। সঙ্গে সঙ্গে এবারের সংসদে বিরোধী দলেরও শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে। রাজনীতিতে অনেক নতুন মুখ এসেছে যারা জনস্বার্থে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলে রাজনীতির গতানুগতিক ধারায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হতে পারে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন দেশের দীর্ঘদিনের 'দুই নেত্রী'র আলোচিত যুগের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটেছে । সেই সঙ্গে দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন ও আইনি লড়াই শেষে তারেক রহমানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশে প্রত্যাবর্তন ও শপথ গ্রহণ নিশ্চিত করে।

এই সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে সাংবিধানিক সংস্কারের পক্ষে-বিপক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ গণভোটও অনুষ্ঠিত হয় এবং দেশের ৬০ শতাংশ ভোটার রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনের প্রস্তুত করা 'জুলাই জাতীয় সনদ'কে সমর্থন জানান। এই ম্যান্ডেট বা গণরায় রাষ্ট্রের কাঠামোগত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধনে সরকারকে আইনি ভিত্তি ও নৈতিক সাহস জোগাবে।

নবনির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরকালে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছিলেন:

"ছাত্র, শ্রমিক এবং সাধারণ জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর ফ্যাসিবাদী সরকারের প্রধান দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন...আমরা একটি বিশৃঙ্খলা ও অবিন্যস্ত দেশ পেয়েছি...স্বৈরাচারী শাসনে ভেঙে পড়া এই দেশকে পুনর্গঠন করা আমাদের সবার দায়িত্ব।"

এই গণরায়কে সম্মান জানিয়ে এবং জুলাইয়ের শহিদদের রক্তের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে নতুন সরকারকে মূলত তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে অতি দ্রুত এবং সুনির্দিষ্টভাবে কাজ করতে হবে :

১. সাংবিধানিক বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিরাজনীতিকরণ: বিগত সরকার প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে এক দশকেরও বেশি সময় টিকে ছিল। বিচার বিভাগ, পুলিশ বাহিনী, বেসামরিক প্রশাসন এবং দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) কার্যত বিরোধীদের দমনের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছিল। আমরা আশা করব আইনসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিএনপি আওয়ামী লীগের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথে হাঁটবে না। গণতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষা করেই বিএনপি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে, যাতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আর কখনো 'ফ্যাসিবাদ' জন্ম নিতে না পারে।

২. সামষ্টিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার: বিগত আমলে দেশের অর্থনৈতিক মডেলটি গড়ে উঠেছিল গুটি কয়েক রাজনৈতিক সুবিধাভোগী অলিগার্ক বা লুটেরা এলিটদের ওপর ভিত্তি করে। একদিকে ব্যাংকিং খাতকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ঋণের নামে খালি করা হয়েছে এবং অন্যদিকে হুন্ডির মাধ্যমে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার করা হয়েছে।

আজ তাই দেশের অর্থনীতি ঠিক করা কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতির গতি চাঙ্গা করতে না পারলে সামাজিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখা কঠিন হবে। ২০৩৪ সালের মধ্যে অর্থনীতিকে এক ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার যে উচ্চাভিলাষী নির্বাচনি ইশতেহার বিএনপি দিয়েছে, তা দীর্ঘমেয়াদি; কিন্তু মানুষের এখন প্রয়োজন তাৎক্ষণিক স্বস্তি।

৩. শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার: জুলাই আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল দেশের তরুণ প্রজন্ম, তাদের আজ উৎপাদনমুখী কাজ দিতে হবে। তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিতে হবে। তাদের জন্য পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। অভ্যুত্থানের সময় দেশের মোট বেকার জনগোষ্ঠীর মধ্যে তরুণদের হার ছিল চোখ কপালে তোলার মতো– ৮৩ শতাংশ!

এ অবস্থা বদলাতে হলে নতুন সরকারকে মানবসম্পদ-ভিত্তিক উন্নয়নে জোর দিতে হবে। চাকরির বাজার নিয়ন্ত্রণকারী যে দলীয় ছাত্ররাজনীতি ও টেন্ডারবাজির সংস্কৃতি অতীতে ছিল, তা চিরতরে বদলে ফেলতে হবে। 'জেন-জি'র এই রাজনৈতিক জাগরণ ইতিমধ্যেই দেশের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এটা মাথায় রেখে কাজ করতে হবে।

গণতান্ত্রিক জাগরণ ও নতুন সূর্যোদয়

দীর্ঘ কয়েক দশকের সাংবাদিকতা জীবনে আমি ক্ষমতার অনেক পালাবদল দেখেছি। ইতিহাসের চেয়ে নির্মম বিচারক আর কে হতে পারে? সাধারণ মানুষ অপরাজেয়। তারা দুঃখকষ্ট সহ্য করে বেঁচে

থাকে। কিন্তু তারা খাঁটি মানুষ, অদম্য সাহস নিয়ে তারা ইতিহাস সৃষ্টি করে। নতুন প্রশাসনের সামনের পথটা যে কণ্টকাকীর্ণ ও অত্যন্ত শ্রমসাধ্য, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের যেটা বুঝতে হবে তা হলো এ দেশের সাধারণ মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক জাগরণ, যা বাংলাদেশের জন্য এক অন্ধকার বিদীর্ণকারী ভোরের বার্তা নিয়ে এসেছে।

রাজপথে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সামনে যে তরুণরা বুক পেতে দিয়েছিল, তারা কেবল ক্ষমতার পালাবদলের জন্য রক্ত দেয়নি; তারা লড়াই করেছিল রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যকার সম্পর্ক নতুন করে নির্ধারণের জন্য। কর্তৃত্ববাদী শাসনের অচলায়তন ভাঙ্গা এ দেশের অদম্য তারুণ্য আমাদের শক্তির উৎস এবং ভরসার জায়গা।

অনেকেই হয়তো সংশয় প্রকাশ করতে পারেন, এত বড় ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে কি সত্যিই এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা সম্ভব? একজন প্রবীণ সংবাদকর্মী হিসেবে আমার সুস্পষ্ট উত্তর : হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব। এর প্রধান কারণ, এই আত্মত্যাগ ও জাগরণ আমাদের সমাজ থেকে 'ভয়ের সংস্কৃতি' চিরতরে মুছে দিয়েছে। যে রাষ্ট্রযন্ত্র একসময় দমনপীড়নের মাধ্যমে জনগণকে নীরব করে রাখত, আজ সেই জনগণই রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। নাগরিকের এই নির্ভীক মানসিক স্বাধীনতা একটি দেশের সৃজনশীলতা ও রাজনৈতিক জবাবদিহিতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এখন এই তরুণ প্রজন্ম বা 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'। বৈশ্বিক ডিজিটাল অর্থনীতিতে এই প্রযুক্তিবান্ধব প্রজন্মের হাত ধরেই বাংলাদেশ এক নতুন পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা ধারণ করে। বিগত আমলের 'ক্রনি-ক্যাপিটালিজম' বা গুটি কয়েক মানুষের পকেট ভারী করার যে দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থনৈতিক মডেল ছিল, তা আজ জনগণের চাপে ভেঙে পড়তে বাধ্য। রাষ্ট্র এখন একটি স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাধ্য হবে, যা দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ উন্মুক্ত করবে এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

এ দেশের তরুণদের বুকের রক্ত আর নজিরবিহীন সাহসের আগুনে যে নতুন বাংলাদেশের নকশা খোদাই করা হয়েছে, তা কখনোই ব্যর্থ হতে পারে না। বিশ্ব আজ বাংলাদেশের এক সত্যিকারের, চূড়ান্ত ও ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার উদয় দেখছে। বাংলাদেশ আজ কেবল মানচিত্রের বুকে একটি রেখা নয়; বাংলাদেশ আজ বিশ্বমঞ্চে এক অপরাজেয় সাহসের প্রতীক, যারা প্রমাণ করেছে যে ঐক্যবদ্ধ জনতার অদম্য শক্তি ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে পারে এবং এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে জাতিকে নিয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের এই বীরত্বগাথা আজ বিশ্বের অন্যান্য নিপীড়িত জাতিগুলোর জন্যও এক মুক্তির আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে। তাদের এই অভূতপূর্ব জাগরণ দেখে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষও আজ অবিচারের শৃঙ্খল ভেঙে একই পথে হেঁটে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে আনতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে, যা এই ঐতিহাসিক জুলাই বিজয়কে করে তুলেছে সর্বজনীন ও কালজয়ী।

লেখক : সাবেক নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইত্তেফাক এবং সম্পাদক, সাপ্তাহিক রোববার

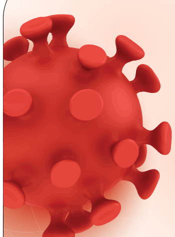

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সতর্কতা

সম্প্রতি পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাসের নতুন সাব-ভ্যারিয়েন্ট বিশেষ করে অমিক্রন LF.7, XFG, JN.1 এবং NB.1.8.1 এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংক্রমণ প্রতিরোধে আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্দেশনাসমূহ

- বারবার প্রয়োজনমত সাবান দিয়ে হাত ধুবেন (অন্তত ২০ সেকেন্ড)
- নাক-মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করুন
- আক্রান্ত ব্যক্তি হতে কমপক্ষে ৩ ফুট দূরে থাকতে হবে
- অপরিষ্কার হাতে চোখ, নাক ও মুখ স্পর্শ করবেন না
- হাঁচি-কাশির সময় বাহু/টিস্যু/কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে রাখুন
- জনসমাগম এড়িয়ে চলুন

সন্দেহজনক রোগীদের ক্ষেত্রে করণীয়

- অসুস্থ হলে ঘরে থাকুন, মারাত্মক অসুস্থ হলে নিকটস্থ হাসপাতালে যোগাযোগ করুন
- রোগীর নাক-মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করতে বলুন
- প্রয়োজন হলে আইইডিসিআর এর হটলাইন নাম্বারে যোগাযোগ করুন (০১৪০১-১৯৬২৯৩)

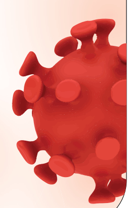

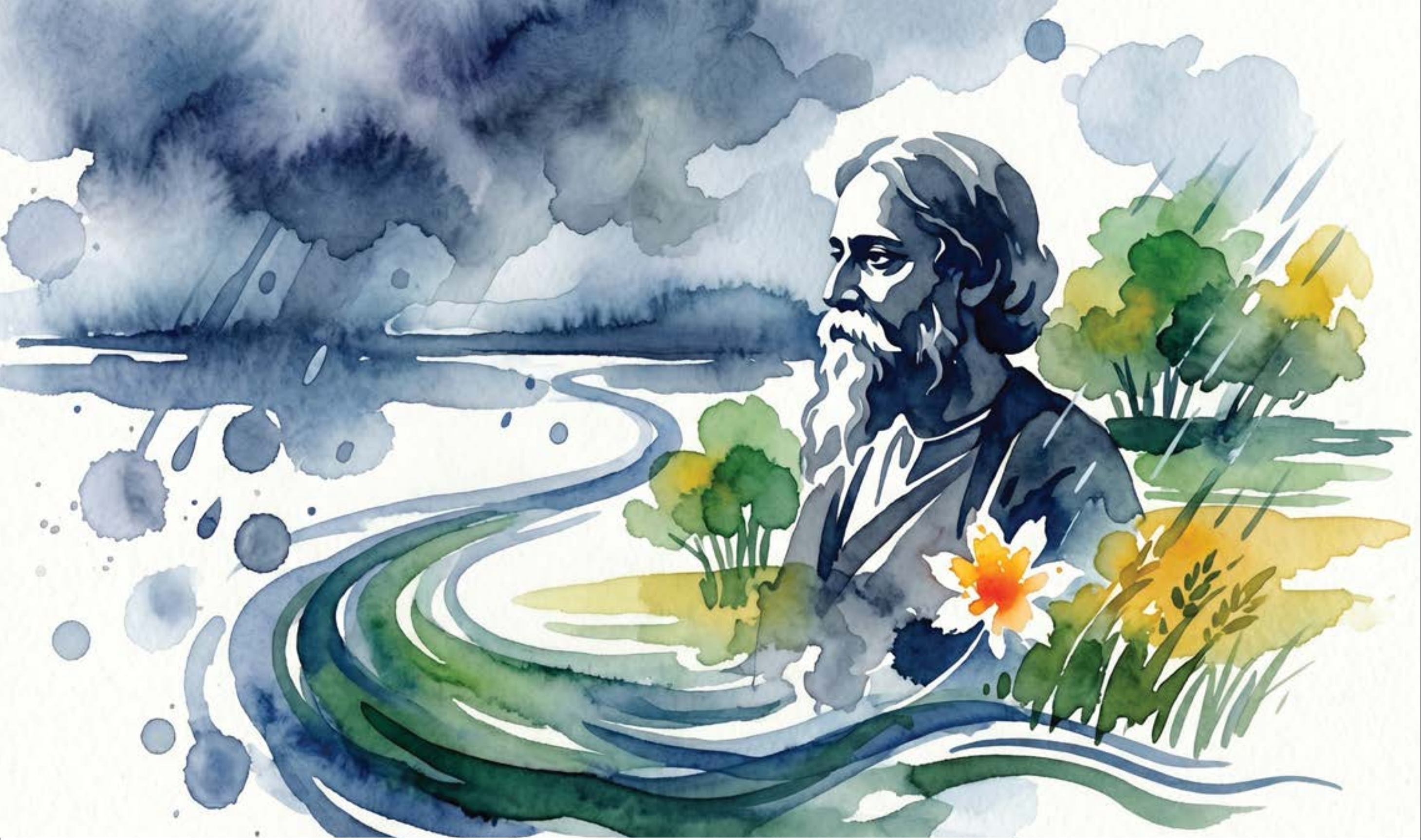

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশের বর্ষা ঋতু

জায়েদুল আলম

রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশের বর্ষা ঋতু নিবিড়ভাবে প্রভাবিত করেছে। কারণঃ পৈতৃক জমিদারি দেখাশোনা করার জন্য তাঁকে বাংলাদেশের শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসর বারবার যাতায়াত করতে হয়েছে। ঘনঘন এত বার আসা-যাওয়ার ফলে গ্রামবাংলার বর্ষা, বর্ষণ ও নদনদীর সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটেছে।

ফলে বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশ তাঁর মনের মধ্যে স্থায়ী একটি আসন গড়ে তোলে। আমৃত্যু তিনি তা মনের গভীরে যত্ন করে রেখেছিলেন। তাঁর নানা কথায়, কাহিনিতে, কবিতায় ও গানে তা প্রকাশ করেছেন। বৃষ্টির ধ্বনি তাঁকে এতই আকৃষ্ট করত যে ছেলেবেলায় তিনি 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এলো বান' ছড়াটি লিখেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সে শিলাইদহ এলাকায় এসে তাঁর যে বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়, তা তাঁর ভাবনার জগতে গুণগত ও নান্দনিক পরিবর্তন এনে দেয়।

বৃষ্টি যখন ঝমঝম করে পড়তে থাকে, তখন কবিরও প্রাণভরে গান, কবিতা, কাহিনি লেখার আগ্রহ প্রবলভাবে বেড়ে যায়। তখন তাঁর চিঠি, গদ্যের বদলে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করেছে। কবি তখন গীতিকার।

বৃষ্টিঝরা রাতদিনের মায়াবী প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের বর্ষা ঋতুর গানে। অনেকের মতে, এই পর্যায়ের গানগুলো সবচেয়ে জনপ্রিয় গান। গীতবিতানের প্রকৃতি পর্যায়ের মধ্যে বর্ষা ঋতুর গানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, ১৩৪ বা ১৩৫টির মতো। যদিও এর সবগুলোই গ্রামবাংলায় বসে লেখা নয়, তবু অন্যান্য অঞ্চল থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলোতেও তাঁর বর্ষণপ্রীতি ফুটে উঠেছে। শ্রাবণের বর্ষা যে রবীন্দ্রনাথের গানের একটি উৎস তার প্রমাণ মেলে 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' নামের অতীব জনপ্রিয় একটি গানে। পদ্মা-শিলাইদহের প্রকৃতি ও পরিবেশ রবীন্দ্রনাথকে এতটা মজিয়ে রেখেছিল যে তিনি ভিন্ন ধরনের কবিতা বা গানেও নৌকাভরা সোনালি পাকা ধান, ছুটে চলা জলস্রোতের কথাও লিখেছেন। 'বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ়' গানটি যেন সে কথা মনে করিয়ে দেয়।

কবিগুরুর 'বর্ষার দিনে' কবিতায় লিখেছেন– "এমন দিনে তারে বলা যায়,/ এমন ঘনঘোর বরিষায়–/ এমন মেঘস্বরে বাদল-ঝরঝরে/ তপনহীন ঘন তমসায়।।/ সে কথা শুনিবে না কেহ আর,/ নিভৃত নির্জন চারি ধার।/ দুজনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখি,/ আকাশে জল ঝরে অনিবার–/ জগতে কেহ যেন নাহি আর।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত সোনার তরী কবিতায়ও তিনি এঁকেছেন বর্ষার চিত্র। সেখানে লিখেছেন– "গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা/ কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।/ রাশি রাশি ভারা ভারা/ ধান কাটা হল সারা,/ ভরা নদী ক্ষুরধারা/ খরপরশা–/ কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।"

কবি বর্ষায় কখনো খুঁজেছেন গভীরতা, কখনো রোমান্টিকতা। কোথাও-বা বর্ষার প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন। যেমন তাঁর আষাঢ় কবিতায়– "নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর/ নাহি রে।/ ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের/ বাহিরে।/ বাদলের ধারা ঝরে ঝরঝর,/ আউশের ক্ষেত জলে ভরভর,/ কালি মাখা মেঘে ও পারে আঁধার ঘনিছে দেখ চাহি রে।/ ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।"

কবিগুরু এমন প্রতীক্ষায় থেকে বলছেন, "মেঘের পরে মেঘ জমেছে/ আঁধার করে আসে/ আমায় কেন বসিয়ে রাখ/ একা দ্বারের পাশে।/ কাজের দিনে নানা কাজে/ থাকি নানা লোকের মাঝে,/ আজ যে আমি বসে আছি/ তোমারই আশ্বাসে।" দিন পেরিয়ে গেলেও, আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও বর্ষার সে রূপ এখনো তেমনি আছে। সেই কালো মেঘে ঢেকে থাকা, অঝোরধারায় বৃষ্টি এসব কিছুই বর্ষার বৈশিষ্ট্য। এমনই এক মেঘের দিনের বর্ণনা পাওয়া যায় কবির 'বর্ষাযাপন' কবিতায়।

কবি লিখেছেন, "দিগন্তের চারিপাশে আষাঢ় নামিয়া আসে/ বর্ষা আসে হইয়া ঘোরালো,/ সমস্ত আকাশ-জোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া/ চিকমিকে বিদ্যুতের আলো।"

বর্ষার নতুন জল পেয়ে বৃক্ষরাশি জেগে উঠেছে নতুন করে। যেন তারা এতদিন ধরে আকাশের কাছে প্রার্থনায় ছিল। কখন বৃষ্টি নেমে তাদের প্রাণ ফেরাবে। নদনদী পুকুর সব পানিতে ভরে যায়। নদী তার যৌবন ফিরে পায় এই বর্ষায়। শুধু নদী কেন বর্ষার অপেক্ষায় থাকে আরো কত সৃষ্টি। কবির 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে' কবিতায় লিখেছেন– "আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে–/ আসে বৃষ্টির সুবাস বাতাস বেয়ে।/ এই পুরাতন হৃদয় আমার আজি/ পুলকে দুলিয়া উঠিছে আবার বাজি/ নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে/ আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।"

প্রতি বর্ষায় তিনি রচনা করেছেন নতুন নতুন গান, যেসব আজও স্পন্দন জাগায় আমাদের মনে। বৃষ্টির ফোঁটা ঝরলেই আমরা গাইতে থাকি– "আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে/ জানি নে, জানি নে কিছুতেই কেন মন লাগে না..." কিংবা– "এমন দিনে তারে বলা যায়/ এমন ঘনঘোর বরিষায়,/ এমন মেঘস্বর বাদল-ঝরঝরে/ তপনহীন ঘন তমসায়...।" 'বাদল দিনের প্রথম কদমফুল' হাতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন কবি। বলতেন "মন মোর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিগ-দিগন্তের পানে..." কিংবা বৃষ্টির ছোঁয়ায় যখন আনন্দে নেচে উঠত মন, তিনি গেয়ে উঠতেন : "হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে..."। বর্ষার দিনে এসব গান গুনগুন করে বহু বর্ষাপ্রেমিক, বহু রবীন্দ্রপ্রেমিক। মনের অজান্তেই মনে জেগে ওঠে প্রেম। এমনই হৃদয়ছোঁয়া শত শত বর্ষার গান লিখেছেন তিনি। গীতবিতানে প্রকৃতি পর্যায়ের গানের সংখ্যা ২৮৩। এর মধ্যে বর্ষা পর্যায়ের গানের সংখ্যাই ১২০টির মতো।

'বর্ষামঙ্গল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন– "স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে/ বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে।/ শশী তারা হীনা অন্ধতামসী যামিনী,/ কোথা তোরা পুরকামিনী।/ আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে,/ জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,/ চমকে দীপ্তদামিনী।/ শূন্য শয়নে কোথা জাগ পুরকামিনী।" কবিতাটিতে কবি কত সুন্দর করে একটি বর্ষা দিন চিত্রায়ণ করেছেন। আবার বর্ষার দিনে সব কেমন যেন স্থবির হয়ে পড়ে। সে কথা বলেছেন, 'অপেক্ষা' কবিতায়– "মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে মিলায়ে থাক মাঠে,/ পড়িয়া থাকে তরুর শিরে,/ কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে,/ দাঁড়ায়ে থাকে দীর্ঘ ছায়া মেলিয়া ঘাটে বাটে।" তাছাড়া 'বর্ষার রূপ' কবিতায় মানবজীবনের প্রবাহকে বর্ষার প্রবাহের সঙ্গে তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। প্রবাহেরও শেষ হয়। রাজ্যের সৌন্দর্য নিয়ে যেমন হাজির হয় বর্ষা, ঠিক তেমনই একটা সময় চলেও যায়। তখনো ভালোবাসা থেকে যায় বর্ষার প্রতি, ইচ্ছে হয় আবার ফিরে পেতে। সেই ইচ্ছেটা কবির কাছে আরো প্রবল। তাই তো তিনি 'মেঘমুক্ত' কবিতায় ডেকেছেন চলে যাওয়া বর্ষাকে– "মেঘ ছুটে গেল, নাই গো বাদল,/ আয় গো আয়,/ আজিকে সকালে শিথিল কোমল বহিছে বায়।/ পতঙ্গ যেন ছবিসম আঁকা/ শৈবাল-পরে মেলে আছে পাখা,/ জলের কিনারে বসে আছে বক গাছের ছায়,/ আজ ভোর থেকে নাই গো বাদল,আয় গো আয়।"

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বর্ষার বাস্তবতা অধিকতরভাবে ধরা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'পোস্টমাষ্টার', 'সমাপ্তি', 'জীবিত ও মৃত', 'একরাত্রি', 'মহামায়া', 'শাস্তি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'মণিহারা' এবং বেশি করে বলতে হয় 'অতিথি' গল্পটির কথা। এগুলোর মধ্যে পদ্মা, অবিরাম বৃষ্টি, ঝড়জলের একটা না একটা প্রসঙ্গ আছেই। তবে 'জীবিত ও মৃত' গল্পটি শ্রাবণ মাসে লেখা। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে রবীন্দ্রনাথ বর্ষায় নিস্পন্দ বাংলাদেশের থমকে দাঁড়ানো রূপটি এঁকেছেন এভাবে :'বন্যার সময়ে গোরুগুলি যেমন জলবেষ্টিত মলিন পঙ্কি সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠ প্রাঙ্গণে মধ্যে ভিড় করিয়া করুণ নেত্রে সহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া শ্রাবণের ধারা বর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাংলাদেশ আপনার কর্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মূকবিষণ্ণমুখ সেইরূপ পীড়িতভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগল। চাষিরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে; স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বায়ুতে সঙ্কুচিত হইয়া কুটির হইতে কুটিরান্তরে গৃহকার্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্তবস্ত্রে জল তুলিতেছে এবং গৃহস্থ থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া, জুড়ো হস্তে, ছাতি মাথায় বাহির হইতেছে অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাপ্লাবিত বঙ্গদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।

'আবার 'সমস্যাপূরণ' গল্পে-"ছোটো একটা নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকায় এবং কতক ডাঙায় কেনাবেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আষাঢ় মাসে কাঁঠালের আমদানিই সবচেয়ে বেশি, ইলিশ মাছও যথেষ্ট। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্রেতা বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁশ পুঁতিয়া তাহার ওপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।"

বর্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন গান, কবিতা, ছড়া, গল্প এমনকি জীবনস্মৃতিও। তাঁর বর্ষাবন্দনা এতই সমৃদ্ধ যে বাংলা সাহিত্যে এমন বর্ষাবন্দনা মেলা ভার। তাই রবীন্দ্রনাথ হতে পেরেছেন, বাংলাদেশের বর্ষার রবীন্দ্রনাথ।

লেখক : শিক্ষাবিদ ও লেখক

আষাঢ় বেঁধেছে ঘর

সুমন সরদার

বোশেখের কত ধূলিঝড়ে ঢেকে গেছে সেই পথ
দিন যায়, আষাঢ়ের ঢল
সেই পথে আয়না বিছিয়ে দেয়–
কর্দমাক্ত চেনাপথ– বড়ই অচেনা মনে হয়।
সে পথের প্রান্ত চলে গেছে উত্তাল নদীর স্রোতে
আমিও মাথায় কাদা মেখে চলে যাই কতদূর!

শ্যামসিদ্ধি সাঁকোর স্মৃতিতে সাঁতার কেটেছি কত
যুদ্ধ থেকে ফিরে তোমার কবরে শুকনো ফুল দেখে,
সেই থেকে আমার দুচোখে আষাঢ় বেঁধেছে ঘর।
কোন এক অদৃশ্য জোনাকি নীরবে ছড়িয়ে গেছে–
আলোর গোপন মানচিত্র, যা এঁকেছিলাম আমরা
আড়িয়াল বিলে পাকা মটরশুঁটি তুলতে তুলতে।

ধীরে ধীরে বুকের ভেতর আঁকা জীবন-দর্শন
বর্ষাকালে শিশুর কোমরে ঝুমঝুমি বাজার শব্দ
বউকথাকও পাখির মধুর ডাকে জেগে ওঠা–
সবই জড় ও প্রাণের মাঝে বহমান বক্ররেখা
সরল রেখার কামনায় পথ পিছলে পড়ে গেছি
সেই কবে... কোনকালে....
পাহাড়ের ঢালে দুজন দুদিকে...

তোমার-আমার যুগল সময়ে
কত ভালোবাসা, প্রেমময় স্মৃতি
এতদিনে কিংবদন্তি গল্পে মিশে গেছে!

তাই পৃথিবীতে পড়ে থাকা সেই সব ভস্ম নিয়ে
গবেষণাগারে তুলে রাখে কোন এক মনোবিদ
কিংবা যত্নে তুলে রাখে ঠাকুরমা গল্পের ঝুলিতে!

অদ্ভুত জিন্দেগির নান্দীপাঠ

হাসান সেলিম

এভাবেই দিন চলে যায়, দিনের ওপারে
অদ্ভুত এক জিন্দেগির নান্দীপাঠ করতে করতে
হঠাৎ দেখি রাত্রির হাতছানি– একটা মায়াময় ঘোর!
ঘোরের ভেতর দূরে-কাছে কে যেন বলে ওঠে
'হরি দিন যে গেলো সন্ধ্যা হলো'–
বিমূর্ত স্মৃতির অলিগলি হাতড়ে দেখি–
স্মৃতির বহরে কেবলই যুক্ত হয় আরেকটি পালক,
তখন কেন জানি মনে হয়
জীবন তো আর কিছু নয়
শুধুই স্মৃতির সমাহার!
স্মৃতি-বিস্মৃতির ঘেরাটোপে উবু হয়ে পড়ে থাকে।
প্রিয়–
তোমার কথা খুব মনে পড়ে
অথচ কী আশ্চর্য!
ক্রমশ তুমি যেন দূর থেকে আরো দূরে
সরে সরে যাও,
কী এক অমোঘ মোহে নিজেকে লুকাও
চিরচেনা পাখি অচেনা সুরে
নতুন কথা বলে যাও,
আমি পথ হাঁটতে হাঁটতে বহুদূরের শ্রান্ত পথিক
মুমূর্ষু সময় বয়ে বয়ে
এখানেই রয়ে যাই,
এখানে আমার কেউ নেই, কিছু নেই,
কোনো কালে ছিল কি?
জানা নেই।

দেশি ও স্থানীয় পরিবেশ উপযোগী বৃক্ষরোপণ কেন বাংলাদেশে এই মুহূর্তে অপরিহার্য?

আশিকুর রহমান সমী

আমার জন্ম আর শৈশব বরিশালের প্রত্যন্ত এক গ্রামে, আর এই আর্টিকেলটি যখন লিখছি, ঠিক আমার ছোটবেলার সেই গ্রামেই বসে আছি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, মালকোহা, বউ কথা কও, পাতি চোখ গেল, রাতচোরা, প্যাঁচাসহ অসংখ্য পাখপাখালির ডাক ভেসে আসছে। কিন্তু ছোটবেলার মতো গ্রামটি আজ নেই। আজ আগের মতো সেই সবুজে ঢাকা, ঘন বাগান, লতাগুল্মসমৃদ্ধ গ্রাম যেখানে ছিল হাজারো পাখপাখালি, পতঙ্গ আর জোনাকির মেলা তা একেবারে অনুপস্থিত। সবুজ গ্রামগুলো আজ কবিতায়, গল্পে থাকলেও তথাকথিত উন্নয়নের ছোঁয়া গ্রামগুলোর প্রাকৃতিক পরিবেশকেও করছে বিপন্ন। যার ফলে অপরিকল্পিতভাবে সবুজ শূন্য হয়েছে সারা দেশ।

বাংলাদেশ আজ এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। জলবায়ু পরিবর্তন, বনভূমি ধ্বংস, জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয়, জলাভূমি সংকোচন এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল হারানোর মতো বহুমাত্রিক সংকট আমাদের পরিবেশকে প্রতিনিয়ত দুর্বল করে দিচ্ছে। এমন বাস্তবতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের দেশি গাছ রোপণের উদ্যোগ এবং দেশব্যাপী ২৫ কোটি গাছ লাগানোর মহাপরিকল্পনা নিঃসন্দেহে একটি সময়োপযোগী, দূরদর্শী ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। এই উদ্যোগ কেবল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নয়; বরং বাংলাদেশের প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ পুনরুদ্ধারের একটি সম্ভাবনাময় ভিত্তি হতে পারে। তবে এই উদ্যোগের সফলতা নির্ভর করবে একটি মৌলিক বিষয়ের ওপর কোন গাছ লাগানো হচ্ছে। কারণ শুধু সংখ্যার বিচারে কোটি কোটি গাছ লাগানো যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন দেশি এবং স্থানীয় পরিবেশ উপযোগী বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ঝোপঝাড় ও জলজ উদ্ভিদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃতিকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার নিজস্ব পরিচয়। তাই এখানে সরকারের আন্তরিকতার পাশাপাশি প্রয়োজন প্রশাসনের সরকারের উদ্যোগকে উপলব্ধি করা, গবেষকদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং পরিবেশকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এটি শুধু একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি নয়, এটি বাংলাদেশের প্রকৃতিকে পুনর্জাগরণের একটি পদক্ষেপ। কিন্তু বিষয়টি বাস্তবায়নে সরকারকেই মনোযোগ দিতে হবে কিছু বিষয়ে। পাশাপাশি মনে রাখতে হবে, আমাদের এই রোপণকৃত গাছগুলো যেন আবাসস্থল এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নায়ন ভূমিকা রাখে এবং বিশেষায়িত প্রাণীদের আবাসস্থল সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রকৃতির স্বকীয়তা ও স্থানীয় উদ্ভিদের গুরুত্ব নির্ণয়

প্রকৃতির প্রতিটি অঞ্চল তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বহন করে। বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চল, শালবন, মধুপুর গড়, সুন্দরবন, হাওর, বিল, চরাঞ্চল কিংবা উপকূলীয় অঞ্চল প্রতিটি স্থানের

পরিবেশ, মাটি, জলবায়ু এবং জীববৈচিত্র্যের গঠন আলাদা। এই ভিন্নতার কারণেই গড়ে উঠেছে উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্ময়কর বৈচিত্র্য।

বাংলাদেশ ২২টি জীব পরিবেশীয় অঞ্চলে বিভক্ত। আর এই ২২টি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য আলাদা, উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্য আলাদা। আর তাই আমাদের এই বিষয়গুলো সবার আগে নজরে রাখতে হবে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে তার কথায় উল্লেখ করেছেন। একটি অঞ্চলের উদ্ভিদবৈচিত্র্যই মূলত নির্ধারণ করে সেখানে কী ধরনের প্রাণী বাস করবে। পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী, পতঙ্গ, এমনকি অণুজীবের জীবনচক্রও স্থানীয় উদ্ভিদের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাই স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়া দেশীয় বৃক্ষ হারিয়ে গেলে সেই অঞ্চলের পুরো প্রতিবেশব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ কারণেই এখন সময় এসেছে পুরোনো স্লোগান 'গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান'কে নতুন বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে বলার 'দেশি ও অঞ্চল উপযোগী গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান'।

আগে জানতে হবে কোন গাছ হারিয়ে যাচ্ছে এবং প্রাকৃতিক গুরুত্বসম্পন্ন গাছ

বৃক্ষরোপণের আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো একটি এলাকার স্থানীয় উদ্ভিদসম্পদ চিহ্নিত করা। অতীতে কোন গাছ ছিল, কোনগুলো এখনো টিকে আছে এবং কোনগুলো বিলুপ্তির পথে— এসব তথ্য সংগ্রহ করা জরুরি। একটি এলাকার বৃক্ষ, তরু, লতা, গুল্ম, ঝোপঝাড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রাণিকুলের বিন্যাস বিশ্লেষণ না করে বৃক্ষরোপণ করলে অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবেশগত সুফল পাওয়া যায় না। বরং ভুল পরিকল্পনা দীর্ঘ মেয়াদে পরিবেশের ক্ষতি করতে পারে।

সুতরাং দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির প্রথম ধাপ হওয়া উচিত অঞ্চলভিত্তিক উদ্ভিদ ও প্রাণীবৈচিত্র্যের বৈজ্ঞানিক জরিপ। স্থানীয় জনগণের স্মৃতি, পুরোনো বন ব্যবস্থাপনা নথি, গবেষণা প্রতিবেদন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তথ্য ব্যবহার করে প্রতিটি অঞ্চলের দেশীয় উদ্ভিদের তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

বিদেশি গাছের একক বনায়ন কেন সমস্যার সৃষ্টি করেছে

গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় দ্রুত বর্ধনশীল বিদেশি গাছের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। বিশেষ করে, আকাশমণি ও ইউক্যালিপটাস সামাজিক বনায়ন, রাস্তার ধারে, সরকারি প্রকল্প এবং অনেক বনাঞ্চলে ব্যাপকভাবে রোপণ করা হয়েছে। প্রথমদিকে এসব গাছ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক মনে হলেও পরিবেশগত বাস্তবতা ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছে। ইউক্যালিপটাস মাটি থেকে বিপুল পরিমাণ পানি শোষণ করে। ফলে আশপাশের জমি শুষ্ক হয়ে পড়ে এবং স্থানীয় উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এর পাতা সহজে পচে জৈবপুষ্টিতে পরিণত হয় না। ফলে মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অন্যদিকে আকাশমণির একক বনায়নে নিচু স্তরের গুল্ম, ঘাস ও প্রাকৃতিক উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। এতে বনভূমির প্রাকৃতিক স্তরবিন্যাস নষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃত বন কেবল বড় গাছের সমষ্টি নয়। সেখানে থাকে ছোট গাছ, লতা, ঝোপঝাড়, ঘাস, ছত্রাক, পচনশীল জৈব পদার্থ এবং অগণিত অণুজীব। এই জটিল সম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে একটি সুস্থ প্রতিবেশব্যবস্থা। বিদেশি একক প্রজাতির বনায়ন এই সম্পর্ককে দুর্বল করে বনকে জীববৈচিত্র্যহীন কাঠের বাগানে পরিণত করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংরক্ষিত বনের দিকে তাকালেই বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। বিশেষ করে শালবন, চট্টগ্রামের সংরক্ষিত বনাঞ্চল। ভুল বৃক্ষ রোপণ কীভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে প্রাকৃতিক বনকে।

দেশীয় গাছ ও বন্যপ্রাণীর সহাবস্থান

হাজার বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের দেশীয় বৃক্ষ ও বন্যপ্রাণীর মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একটি বটগাছ, পাকুড়গাছ কিংবা ডুমুরগাছ প্রাণীর খাদ্য ও আশ্রয়ের উৎস। কদম, চালতা, করচ, বরুণ, পলাশ, শিমুল, শেফালি, কদম, ডেউয়া, জাম, ছাতিম, অর্জুন, বেত, বাঁশসহ বিভিন্ন দেশীয় উদ্ভিদ অসংখ্য পাখি, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী ও ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী প্রাণীর জীবনধারণে সহায়তা করে। বিভিন্ন ফলদ দেশীয় বৃক্ষ মৌসুমভেদে খাদ্য সরবরাহ করে। ফুল উৎপাদনকারী দেশীয় গাছ মৌমাছি, প্রজাপতি ও অন্যান্য পরাগায়নকারী পতঙ্গকে আকর্ষণ করে। এই পতঙ্গ আবার কৃষি উৎপাদন ও প্রাকৃতিক উদ্ভিদের বংশবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বিদেশি গাছভিত্তিক বনায়নে এই খাদ্য ও আশ্রয়ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। ফলে পাখি, প্রজাপতি, মৌমাছি, উভচর ও সরীসৃপ প্রাণীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

সংরক্ষিত এলাকার বাইরের জীববৈচিত্র্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের একটি বড় অংশ জাতীয় উদ্যান বা সংরক্ষিত এলাকার বাইরে বসবাস করে। গবেষণা বিশ্লেষণে দেখা যায়, দেশের বিলুপ্তির ঝুঁকিতে থাকা বহু প্রজাতির প্রাণী গ্রামীণ বন, শহুরে সবুজ এলাকা, কৃষিজমির আশপাশের ঝোপঝাড়, জলাভূমির পাড় এবং মানুষের বসতির কাছাকাছি পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। মেছো বিড়াল, খ্যাঁকশিয়াল, উদ্‌বিড়াল, রেসাস বানর, যশোরের হনুমান, মুখপোড়া হনুমান, বুনো খরগোশ, মায়া হরিণ, বিন্টুরং, গাঙ্গেয় শুশুক ও হাতির মতো প্রাণীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব প্রাকৃতিক আবাসস্থলের ওপর নির্ভরশীল। পাখিদের মধ্যে ধলাগলা মানিকজোড়, রাঙা মানিকজোড়, কালা মানিকজোড়, কালোমাথা কাস্তেচরা, দেশি গাঙচোষা, ছোট মদনটাক, ধলাকপাল রাজহাঁস এবং পালসি কুড়া ইগলের মতো প্রজাতি জলাভূমিনির্ভর উদ্ভিদবৈচিত্র্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। আবার হলদে চোখ ছাতারে, কাঠ ময়ূর ও রাজ ধনেশের মতো বননির্ভর পাখিরা দেশীয় বনজ উদ্ভিদের ওপর নির্ভর করে। সরীসৃপ ও উভচর প্রাণীর ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা বিদ্যমান। কচ্ছপ, গুইসাপ, অজগর, ঘড়িয়াল এবং বহু প্রজাতির ব্যাঙ জলাভূমি ও দেশীয় উদ্ভিদসমৃদ্ধ আবাসস্থলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত।

সরকারি আবাসিক এলাকা ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস হতে পারে জীববৈচিত্র্যের নিরাপদ আশ্রয়

বাংলাদেশে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বলতে আমরা সাধারণত জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য বা সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে বুঝি। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দেশের বহু বিপন্ন ও হুমকিগ্রস্ত বন্যপ্রাণী আজ সংরক্ষিত এলাকার বাইরেও টিকে আছে। বিশেষ করে সরকারি আবাসিক এলাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, সামরিক স্থাপনার সবুজ অঞ্চল, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারি দপ্তরের বিস্তীর্ণ সবুজ চত্বর বর্তমানে অনেক প্রাণীর গুরুত্বপূর্ণ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। এসব এলাকায় তুলনামূলকভাবে বৃক্ষ আচ্ছাদন বেশি, মানুষের চাপ কম এবং কিছুটা নিরাপদ পরিবেশ বিদ্যমান থাকায়

নানা ধরনের পাখি, সরীসৃপ, উভচর, ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং অসংখ্য পতঙ্গ বসবাস করে। অনেক ক্ষেত্রে এসব এলাকা শহর ও জনবসতির মধ্যে জীববৈচিত্র্যের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শিয়াল, মেছো বিড়াল, বনবিড়াল, খাটাশ, উদ্‌বিড়াল, বিভিন্ন প্রজাতির বাদুড়, বানর, কাঠবিড়ালী, গুইসাপ, সাপ, কচ্ছপ, ব্যাঙ এবং শতাধিক প্রজাতির পাখির উপস্থিতি পাওয়া গেছে। অনেক পরিযায়ী পাখিও প্রতিবছর এসব এলাকায় আশ্রয় নেয়। বিশেষ করে বড় জলাশয়, পুরোনো বৃক্ষ এবং দেশীয় উদ্ভিদসমৃদ্ধ ক্যাম্পাসগুলো জীববৈচিত্র্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এসব এলাকায় অনেক সময় সৌন্দর্যায়নের নামে বিদেশি শোভাবর্ধনকারী গাছ অথবা জীববৈচিত্র্যের জন্য কম উপযোগী বৃক্ষ লাগানো হয়। ফলে বন্যপ্রাণীরা পর্যাপ্ত খাদ্য, আশ্রয় ও প্রজননস্থল পায় না। তাই সরকারি আবাসিক এলাকা ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোকে ক্ষুদ্র সংরক্ষিত এলাকা বা 'নগর জীববৈচিত্র্য অভয়ারণ্য' হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এসব স্থানে পরিকল্পিতভাবে বন্যপ্রাণীবান্ধব দেশীয় গাছ লাগানো প্রয়োজন। বিশেষ করে বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, ডুমুর, চালতা, ডেউয়া, কদম, জাম, বরই, করচ, হিজল, বরুণ, ছাতিম, অর্জুন, পিতরাজ, শিমুল, বকুল, বেল, আমলকী, বনজ ফলদ বৃক্ষ, বাঁশ ও বেতজাতীয় উদ্ভিদ অধিক পরিমাণে রোপণ করা উচিত। এসব গাছ বিভিন্ন সময়ে ফল, ফুল, মধু, পাতা এবং আশ্রয় প্রদান করে পাখি, বাদুড়, কাঠবিড়ালী, প্রজাপতি, মৌমাছি এবং অন্যান্য বন্যপ্রাণীর জীবনধারণে সহায়তা করে। একই সঙ্গে শুধু বড় গাছ নয়, দেশীয় ঝোপঝাড়, গুল্ম, লতা এবং জলাশয়ের চারপাশে দেশীয় জলজ উদ্ভিদ সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ অনেক উভচর প্রাণী, সরীসৃপ, ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং কীটপতঙ্গ এসব নিম্নস্তরের উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল।

বর্তমানে যখন দেশের প্রাকৃতিক আবাসস্থল দ্রুত সংকুচিত হচ্ছে, তখন সরকারি আবাসিক এলাকা ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিকল্প কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সঠিক পরিকল্পনা ও দেশীয় উদ্ভিদভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এসব এলাকা ভবিষ্যতে বিপন্ন বন্যপ্রাণীর নিরাপদ আশ্রয়স্থল এবং নগর সংরক্ষণ এলাকার সফল উদাহরণে পরিণত হতে পারে। বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় তাই এসব সবুজ অঞ্চলকে শুধু সৌন্দর্যের জায়গা হিসেবে নয়, বরং জীবনের আশ্রয়স্থল হিসেবে বিবেচনা করার সময় এসেছে।

বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা প্রয়োজন

দেশীয় বৃক্ষরোপণকে সফল করতে হলে অবশ্যই বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি জেলার জন্য আলাদা পরিবেশগত কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা প্রয়োজন। পাহাড়ি অঞ্চলের জন্য যে বৃক্ষ উপযোগী, তা হয়তো হাওড় অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত নয়। আবার শালবনের উদ্ভিদবিন্যাস সুন্দরবনের সঙ্গে মিলবে না। এক্ষেত্রে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, বনবিদ্যা, পরিবেশবিজ্ঞান ও ভূগোল বিভাগের শিক্ষক ও গবেষকদের সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। মন্ত্রণালয়, বন বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে অঞ্চলভিত্তিক দেশীয় উদ্ভিদ পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে শুধু বৃক্ষরোপণ নয়, বরং সম্পূর্ণ প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারের সুযোগ তৈরি হবে।

শুধু গাছ নয়, পুরো প্রতিবেশব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে

অনেক সময় বৃক্ষরোপণ বলতে আমরা কেবল বড় গাছ লাগানো বুঝি। কিন্তু প্রকৃতিতে একটি বন গড়ে ওঠে বিভিন্ন স্তরের উদ্ভিদের সমন্বয়ে। বৃক্ষের পাশাপাশি প্রয়োজন লতা, গুল্ম, ঝোপঝাড়, ঘাস, বাঁশ, বেত এবং জলাভূমিভিত্তিক দেশীয় জলজ উদ্ভিদ সংরক্ষণ।

বাংলাদেশের জলাভূমিগুলোতে দেশীয় জলজ উদ্ভিদ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে জলচর পাখি, ব্যাঙ এবং জলজ সরীসৃপ তাদের আবাস ও খাদ্য হারাচ্ছে। তাই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির সঙ্গে জলাভূমির দেশীয় উদ্ভিদ পুনরুদ্ধারকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

শিশু ও তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করতে হবে

দেশীয় বৃক্ষরোপণকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হলে শিশু ও তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করা অপরিহার্য। বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানীয় জীববৈচিত্র্যভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের এলাকার হারিয়ে যাওয়া গাছ চিহ্নিত করতে পারে, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারে এবং স্থানীয় জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণে যুক্ত হতে পারে। একটি শিশু যদি ছোটবেলা থেকে জানে কেন হিজল, করচ, কদম, চালতা, পাকুড়, বট বা ডুমুর গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে ভবিষ্যতে সে প্রকৃতি সংরক্ষণের একজন সচেতন নাগরিক হয়ে উঠবে।

ভবিষ্যতের বাংলাদেশ হবে সবার দেশীয় সবুজের বাংলাদেশ

বাংলাদেশের প্রকৃতি কোটি কোটি জীবের আবাসভূমি। প্রকৃতি সংরক্ষণ মানে শুধু বন রক্ষা নয়, বরং একটি জীবন্ত ও কার্যকর প্রতিবেশব্যবস্থা রক্ষা করা। দেশীয় উদ্ভিদ, দেশীয় প্রাণী এবং স্থানীয় পরিবেশগত সম্পর্কের সমন্বয়েই একটি সুস্থ বন গড়ে ওঠে। বিদেশি প্রজাতির একক বনায়ন কখনো প্রকৃত বন সৃষ্টি করতে পারে না। আজ প্রয়োজন দেশীয় বৃক্ষভিত্তিক একটি জাতীয় আন্দোলন। রাস্তার পাশে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সরকারি স্থাপনায়, গ্রামীণ বসতিতে, শহুরে পার্কে এবং জলাভূমির আশপাশে স্থানীয় পরিবেশ উপযোগী দেশীয় গাছ লাগাতে হবে। একই সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া দেশীয় লতা, গুল্ম, ঝোপঝাড় ও জলজ উদ্ভিদ ফিরিয়ে আনতে হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের ২৫ কোটি গাছ রোপণের উদ্যোগ সেই পরিবর্তনের একটি ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি করেছে। এখন প্রয়োজন এই কর্মসূচিকে বিজ্ঞানভিত্তিক, অঞ্চলভিত্তিক এবং জীববৈচিত্র্যবান্ধব রূপ দেওয়া। তাহলেই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি কেবল সবুজায়নের প্রকল্প হয়ে থাকবে না; বরং বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া প্রকৃতি, বন এবং জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

প্রকৃতি তার নিজস্ব পরিচয় ফিরে পাক, দেশীয় বৃক্ষ আবার ছায়া দিক বাংলার মাঠ-ঘাটে, আর সেই সবুজের বুকে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাক বাংলাদেশের বিপন্ন বন্যপ্রাণী এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

লেখক : প্রভাষক, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বণ্যপ্রাণি বাস্তুবিদ ও গবেষক

শ্রোতার কল্পনার জগৎ : কেন বেতার এখনো অনন্য?

সৈয়দ সাবাব আলী আরজু

'কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।'

শিরোনামে উদ্ধৃত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা এই কবিতাটিতে বিশ্বজনীন যোগাযোগ ও দূরকে নিকট করার যে ভাব প্রকাশিত হয়েছে, তা বেতারের কার্যপ্রকৃতির সঙ্গে এক গভীর সাযুজ্য তৈরি করে। আজ বেতার বা টেলিভিশনের কল্যাণে আমরা ঘরে বসেই 'কত অজানারে' জানতে পারি, 'দূরকে' নিকটে আনতে পারি এবং 'পরকে' আপন করে নিতে পারি। কবিতার এই মানবিক ও বিশ্বসংযোগমূলক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, যোগাযোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেবল তথ্য আদান-প্রদান নয়; বরং দূরত্বকে অতিক্রম করে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও আন্তরিকতার সেতুবন্ধ তৈরি করা। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বেতার একটি অনন্য মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত– যা কণ্ঠ ও শব্দের মাধ্যমে অজানাকে জানায়, দূরকে কাছে আনে এবং শ্রোতার কল্পনার জগতে এক অন্তরঙ্গ সংযোগ সৃষ্টি করে।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে যোগাযোগের মাধ্যমগুলো শুধু তথ্য আদান-প্রদানের পথ তৈরি করেনি; মানুষের অনুভূতি, কল্পনা ও সংস্কৃতিরও বাহক হয়ে উঠেছে। সংবাদপত্র মানুষের চিন্তাকে অক্ষরে রূপ দিয়েছে, টেলিভিশন দৃশ্যের মাধ্যমে বিনোদন ও তথ্যকে দৃশ্যমান করেছে, আর ডিজিটাল মাধ্যম পৃথিবীকে এনে দিয়েছে হাতের মুঠোয়। কিন্তু এই সবকিছুর ভিড়েও একটি মাধ্যম আজও আপন স্বাতন্ত্র্যে টিকে আছে– বেতার।

বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের মনোযোগকে দ্রুত ভেঙে দিচ্ছে। ছোট ছোট ভিডিও, দ্রুত পরিবর্তিত দৃশ্য এবং তথ্যের অতিরিক্ত চাপ মানুষের মনকে ক্লান্ত করে তুলছে। সেখানে বেতার বা অডিও মাধ্যম মানুষের মনকে তুলনামূলকভাবে প্রশান্ত অভিজ্ঞতা দেয়। শ্রোতা শুনতে শুনতে নিজের মতো করে চিন্তা করতে পারেন। এই মনস্তাত্ত্বিক স্বাধীনতাই বেতারের দীর্ঘস্থায়ী আবেদন তৈরি করেছে।

শিল্প মনোবিজ্ঞানী ও মিডিয়া তাত্ত্বিক রুডল্ফ আর্নহাইম (১৯০৪-২০০৭) তাঁর বেতারবিষয়ক গবেষণায় (Radio: An Art of Sound)-এ উল্লেখ করেছিলেন, বেতারের শক্তি তার সীমাবদ্ধতার মধ্যেই নিহিত। কারণ দৃশ্য না থাকায় শ্রোতাকে সক্রিয়ভাবে কল্পনা করতে হয়। এই কল্পনাশক্তির অংশগ্রহণই শ্রোতাকে বেতারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত করে।

বেতারের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো– শব্দ। শব্দের মাধ্যমে মানুষ তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, আবেগ ও স্মৃতির আলোকে দৃশ্য তৈরি করে নেয়। একজন ঘোষকের কণ্ঠ, শিল্পীর গান, নাটকের সংলাপ, আবহসংগীত, বৃষ্টির শব্দ কিংবা দূরের ট্রেনের হুইসেল– এসব মিলিয়ে শ্রোতার মনে তৈরি হয় এক অদৃশ্য নাট্যমঞ্চ। সেখানে প্রত্যেক শ্রোতা নিজের মতো করে দৃশ্য নির্মাণ করেন।

টেলিভিশন বা চলচ্চিত্র দর্শককে নির্দিষ্ট দৃশ্য দেখিয়ে দেয়; কিন্তু বেতার দৃশ্যের স্বাধীনতা দেয় শ্রোতার কল্পনাকে। এই স্বাধীনতাই

বেতারের শিল্পরূপকে অন্য সব মাধ্যম থেকে আলাদা করেছে। বেতার নাটককে অনেক গবেষক 'Blind Theatre' বা 'দৃশ্যহীন নাট্যমঞ্চ' বলে উল্লেখ করেন। এখানে আলো নেই, ক্যামেরা নেই; আছে শুধু শব্দ ও কণ্ঠ-অভিনয়। বেতার নাটকের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো– এটি প্রত্যেক শ্রোতার মনে আলাদা আলাদা দৃশ্য নির্মাণ করে। একজন শ্রোতা যে চরিত্রকে যেমনভাবে কল্পনা করেন, অন্যজন সেটা ভিন্নভাবে করতে পারেন। ফলে বেতার নাটক একটি গভীর ব্যক্তিগত শিল্প-অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।

বেতারের আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো তার অন্তরঙ্গতা। একজন ঘোষক যখন বলেন, 'প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা...', তখন মনে হয় তিনি যেন প্রত্যেক শ্রোতার ঘরেই বসে কথা বলছেন। বেতারের আন্তরিক কণ্ঠস্বর মানুষের খুব কাছের হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, গ্রামবাংলার অসংখ্য মানুষ আজও বেতারকে আপন বন্ধু মনে করেন। একসময় সন্ধ্যার পর পরিবারের সবাই মিলে বেতারের সামনে বসে নাটক, গান বা সংবাদ শোনার যে সংস্কৃতি ছিল, তা শুধু বিনোদন নয়; সামাজিক বন্ধনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসেও বেতারের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুধু সংবাদ প্রচার করেনি; এটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল বাঙালির সাহস, প্রেরণা ও চেতনার উৎস। মুক্তিযুদ্ধের সময় অবিস্মরণীয় গান, কবিতা, নাটক, কিংবা কথিকা লাখো লাখো মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছে। তখন বেতার শুধু প্রযুক্তি নয়– একটি জাতির আত্মার ভাষা হয়ে উঠেছিল।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে কেউ কেউ মনে করেন, বেতারের প্রয়োজন হয়তো ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। আজও গাড়ি চালানোর সময়, কর্মস্থলে, দোকানে, নিশুতি রাতের নির্জনতায় কিংবা গভীর সাগরে মানুষ বেতার শুনছে। কারণ বেতার এমন একটি মাধ্যম, যা শুনতে শুনতে অন্য কাজও করা যায়। এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সহজেই মিশে যেতে পারে।

বর্তমানে এফএম রেডিও, অনলাইন রেডিও, পডকাস্ট এবং মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে বেতার নতুনরূপে ফিরে এসেছে। প্রযুক্তি বদলেছে, কিন্তু মানুষের শব্দ শোনার আকাঙ্ক্ষা বদলায়নি। বরং ডিজিটাল যুগে শব্দভিত্তিক কনটেন্টের জনপ্রিয়তা আবারও প্রমাণ করছে যে, মানুষ কল্পনার জায়গাটি হারাতে চায় না। পডকাস্টের জনপ্রিয়তা দেখলেই বোঝা যায়– মানুষ এখনো গল্প শুনতে ভালোবাসে, কণ্ঠের আবেগ অনুভব করতে ভালোবাসে।

বেতারের সাফল্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এর সহজলভ্যতা। বিদ্যুৎ বা ইন্টারনেট ছাড়াও অনেক সময় একটি ছোট রেডিও সেট মানুষের তথ্য ও বিনোদনের একমাত্র ভরসা হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার সময় বেতার এখনো সবচেয়ে কার্যকর গণমাধ্যমগুলোর একটি। সংকটের মুহূর্তে দ্রুত ও সহজভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাতে বেতারের বিকল্প খুব কম।

এই উপমহাদেশে তথা বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা আরো গভীর। সংগীত, নাটক, সংবাদ, ভাষাচর্চা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণে বেতার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষভাবে সংগীতের ক্ষেত্রে বেতারের অবদান অনন্য। একসময় বেতারই ছিল শিল্পী সৃষ্টির সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়। অসংখ্য কিংবদন্তি শিল্পী তাঁদের শিল্পীজীবনের প্রথম পরিচিতি পেয়েছেন বেতারের মাধ্যমে।

> বেতারের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো– শব্দ। শব্দের মাধ্যমে মানুষ তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা, আবেগ ও স্মৃতির আলোকে দৃশ্য তৈরি করে নেয়। একজন ঘোষকের কণ্ঠ, শিল্পীর গান, নাটকের সংলাপ, আবহসংগীত, বৃষ্টির শব্দ কিংবা দূরের ট্রেনের হুইসেল– এসব মিলিয়ে শ্রোতার মনে তৈরি হয় এক অদৃশ্য নাট্যমঞ্চ। সেখানে প্রত্যেক শ্রোতা নিজের মতো করে দৃশ্য নির্মাণ করেন।

মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাওয়া সেইসব কণ্ঠ পরবর্তীকালে একটি জাতির সাংস্কৃতিক স্মৃতির অংশে পরিণত হয়েছে।

বেতারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হলো ভাষা ও উচ্চারণের সৌন্দর্য। শুদ্ধ উচ্চারণ, মাধুর্যময় উপস্থাপনা এবং কণ্ঠের আবেগ বেতারকে একটি শ্রুতিনন্দন শিল্পে পরিণত করেছে। বহু শ্রোতা, ঘোষক ও সংবাদপাঠকদের অনুসরণ করে শুদ্ধ উচ্চারণ শিখেছেন। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাষার বিকৃতি ও অপ্রমিত উচ্চারণের প্রবণতা বাড়ছে। এই প্রেক্ষাপটে বেতার আবারও শুদ্ধ ভাষাচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হতে পারে।

আজকের প্রজন্ম দ্রুতগতির দৃশ্যভিত্তিক কনটেন্টে অভ্যস্ত হলেও, মানসিক প্রশান্তি ও গভীর মনোযোগের জন্য আবারও শব্দের দিকে ফিরে আসছে। কারণ কল্পনার আনন্দ মানুষকে মানসিকভাবে সক্রিয় রাখে। যখন কোনো দৃশ্য চোখের সামনে তৈরি করে দেওয়া হয় না, তখন মানুষ নিজেই তার কল্পনার জগৎ নির্মাণ করে। আর এই সৃজনশীল অংশগ্রহণই বেতারকে অনন্য করে তোলে।

সবশেষে বলা যায়, বেতার কেবল একটি গণমাধ্যম নয়; এটি মানুষের অনুভূতি, স্মৃতি ও কল্পনার সেতুবন্ধ। দৃশ্যের আধিপত্যের এই যুগেও বেতার তার নিজস্ব শক্তিতে টিকে আছে, কারণ এটি মানুষের অন্তর্জগৎকে স্পর্শ করতে পারে। সবচেয়ে শক্তিশালী দৃশ্য কখনো কখনো চোখে দেখা যায় না; তা জন্ম নেয় মনের ভেতর, শব্দের স্পর্শে।

দৃশ্যের ভিড়ে শব্দের এই শিল্প আজও মানুষের অন্তর্জগতে বিশেষ স্থান ধরে রেখেছে। আর সেই কারণেই বেতার এখনো অনন্য– কারণ এটি মানুষের কল্পনাকে বাঁচিয়ে রাখে।

*লেখক : সংগীত পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার,
বাংলাদেশ টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র*

গন্ধ

পল্লব শাহরিয়ার

বসুন্ধরার এই আটতলার ফ্ল্যাটে অনিমেষ যখন প্রথম শিফট করে, তখন তার মনে হয়েছিল সে পৃথিবীর চূড়ায় বসে আছে। কাচের দেওয়াল দিয়ে পুরো শহরটাকে পায়ের নিচে দেখা যায়। সাতাশ বছরের এক সফল পুরুষ, যার মাসিক ইনকাম সাত অঙ্কের ঘরে, তার জন্য এর চেয়ে ভালো ঠিকানা আর কিছু হতে পারত না। কিন্তু গত সোমবার থেকে এই স্বর্গরাজ্য নরকে পরিণত হতে শুরু করেছে।

গন্ধটা প্রথম পেয়েছিল সে সোমবার রাতে।

অনিমেষ তখন একটা প্রেজেন্টেশন ফাইল দেখছিল। হঠাৎ নাকে এলো একটা ভ্যাপসা গন্ধ। ঠিক মরা ইঁদুরের মতো নয়, বরং যেন ভিজে স্যাঁতসেঁতে ঘরে কোনো মাংসের টুকরো অনেকদিন ধরে পড়ে থেকে পচে ফুলে উঠেছে। অনিমেষ ভ্রু কুঁচকে চারপাশটা দেখল। তার ফ্ল্যাটে ধুলো ঢোকার জো নেই, কারণ সেন্ট্রাল এসি সব সময় চলে। ভ্যাকিউম ক্লিনার দিয়ে রোজ ঘর পরিষ্কার হয়। তাহলে এই গন্ধ কোত্থেকে এলো?

সে রান্নাঘরের ড্রেন, ফ্রিজের নিচের ট্রে– সব পরীক্ষা করল। কিছুই নেই। সেদিন রাতে পারফিউম ছিটিয়ে সে কোনোমতে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখল গন্ধটা আরো গাঢ় হয়েছে। শুধু গাঢ় নয়, গন্ধটা যেন এখন স্পর্শ করা যায়। বাতাসটা ভারী হয়ে আছে।

অনিমেষের মনে পড়ল, সে সকালে যখন কফি বানাচ্ছিল, কাপে চুমুক দিতেই তার গা গুলিয়ে এলো। কফির সুবাস ছাপিয়ে সেই উৎকট আঁশটে গন্ধটা তার পেটের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। সে বেসিনে কফিটা ঢেলে দিল। তার মনে হলো, কফিটা নয়, সে আসলে নিজের ভেতরের কোনো পচানি গিলে ফেলছে।

দুই.

অফিসে গিয়েও শান্তি নেই। অনিমেষ লক্ষ করল, তার কেবিনে যখনই কোনো সাব-অর্ডিনেট ঢুকছে, তারা নাকে রুমাল চাপা দিচ্ছে বা অস্বস্তিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তার প্রিয় কলিগ রিয়া লাঞ্চের সময় যখন তার পাশে এসে বসল, কয়েক সেকেন্ড পরেই সে মুখটা সরিয়ে নিল।

–অনিমেষ, তুমি কি কোনো নতুন কোলন মেখেছ? খুব স্ট্রং আর...কেমন যেন অদ্ভুত গন্ধ! রিয়া সরাসরি বলেই ফেলল।

অনিমেষ অপ্রস্তুত হয়ে হাসল। আসলে ফ্ল্যাটে মনে হয় মরা ইঁদুর-টিদুর পড়েছে, জামাকাপড়ে হয়তো সেই গন্ধটা বসে গেছে।

কিন্তু সে জানে সে মিথ্যে বলছে। সকালে সে কড়া গরম জলে দুবার গোসল করেছে। দামি শ্যানেল পারফিউম মেখেছে। তবুও এই গন্ধ তাকে ছাড়ছে না কেন? সে বাথরুমে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। নিজের গায়ের গন্ধ শুঁকল সে। না, বাইরে থেকে কোনো গন্ধ নেই। কিন্তু সে যখনই শ্বাস ছাড়ছে, তার মনে হচ্ছে তার ফুসফুসের ভেতর থেকে এক ঝাঁক মাছি ভনভন করে বেরোতে চাইছে।

সেই রাতে শুরু হলো নতুন উপদ্রব। অনিমেষ যখন বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে, তখন চারপাশের নিস্তব্ধতার মধ্যে সে শুনতে পেল একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। ঠিক যেন কেউ বালিশের তলায় জলভরা ফুসফুস নিয়ে কষ্ট করে নিঃশ্বাস টানছে। সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। কেউ নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকারে শুধু এসির নীল আলোটা জ্বলছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ল চার বছর আগের সেই হাইওয়ে। বিশ্ব রোড। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন। অনিমেষ তখন নতুন গাড়ি কিনেছে। নেশার ঘোরে গাড়ি চালাচ্ছিল সে। হঠাৎ চাকার নিচে একটা বিশ্রী আওয়াজ। ব্রেক কষতেই দেখল, একটা মাঝবয়সি

লোক আধমরা হয়ে পড়ে আছে। লোকটার পেটটা চাকার নিচে পিষে গিয়েছিল। অনিমেষ ভয়ে কাঁপছিল। সে লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু তার ক্যারিয়ার, তার জেল হওয়ার ভয় তাকে জাপটে ধরল।

সেদিন ওই বৃষ্টিতে লোকটাকে হিঁচড়ে রাস্তার ধারের একটা খোলা ম্যানহোলের ভেতর ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছিল সে। লোকটা তখনো মরেনি। ম্যানহোলের ভেতর থেকে লোকটা যখন অনিমেষের দিকে চেয়ে হাত বাড়িয়েছিল, সেই নর্দমার জল আর পচা পলিমাটির যে গন্ধটা নাকে এসেছিল– আজকের এই গন্ধটা হুবহু এক!

তিন.

বুধবার সকালে অনিমেষ আবিষ্কার করল তার শরীরের প্রথম পরিবর্তন। গোসল করতে গিয়ে দেখল তার উরুর ওপরের চামড়াটা কুঁচকে গেছে, অনেকটা পুরোনো কাগজের মতো। সে যখন সাবান ঘষতে গেল, একটা বড় অংশ চামড়া বিনা রক্তপাতে তার হাতের মুঠোয় চলে এলো। কোনো ব্যথা নেই, কোনো জ্বালা নেই। কিন্তু চামড়াটার নিচে যা দেখল, তাতে অনিমেষের আর্তনাদ বাথরুমের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো।

চামড়ার নিচে পেশি বা রক্ত নেই। সেখানে থকথক করছে কালচে ধূসর রঙের একটা পদার্থ। অনেকটা পচে যাওয়া লিভারের মতো। আর সেখান থেকেই তিরের মতো ছুটে আসছে সেই সর্বনাশা পচা গন্ধ।

সে পাগলের মতো ডাক্তার মিত্রকে ফোন করল। ডাক্তারবাবু, আমার গায়ের চামড়া খসে পড়ছে! ভেতরের মাংস পচে গেছে! আমি...আমি কি মরে যাচ্ছি?

ডাক্তার মিত্র অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি শান্ত গলায় বললেন, অনিমেষ, শান্ত হও। এটা হয়তো কোনো বিরল ফাংগাল ইনফেকশন বা নেক্রোসিস হতে পারে। তুমি এখনই ক্লিনিকে এসো।

অনিমেষ গাড়ি বের করল। কিন্তু লিফটে উঠতেই পাশের ফ্ল্যাটের এক মহিলা আর তার বাচ্চাটা আর্তনাদ করে উঠল। বাচ্চাটা কাঁদতে কাঁদতে বলল, মা, পচা মাংস! মা, পচা মাংস!

অনিমেষের বুঝতে দেরি হলো না– সে এখন এক চলন্ত শবদেহ। তার ওপরের জেল্লাদার করপোরেট মোড়কটা ধীরে ধীরে ছিঁড়ে পড়ছে, আর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে চার বছর ধরে লুকিয়ে রাখা সেই আদিম পচানি।

চার.

ডাক্তার মিত্রের ক্লিনিকে পৌঁছানোর আগেই অনিমেষ বুঝতে পারল, অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এসিরুমে বসে থাকা সত্ত্বেও তার কপাল দিয়ে চটচটে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। সেই ঘামও স্বাভাবিক নয়; তা যেন পচা নর্দমার জলের মতো দুর্গন্ধযুক্ত। ওয়েটিং রুমে বসে থাকা অন্য রোগীরা একে একে উঠে দূরে গিয়ে দাঁড়াতে লাগল। কেউ কেউ নাকে রুমাল চেপে আড়চোখে অনিমেষকে দেখছে। তাদের চোখে ঘৃণা আর আতঙ্ক।

ডাক্তারের চেম্বারে ঢোকামাত্রই ডাক্তার মিত্র চমকে উঠলেন। তিনি মাস্ক পরা সত্ত্বেও হাত দিয়ে নাক ঢাকলেন। অনিমেষ! এ কী অবস্থা তোমার? তোমার গায়ের এই গন্ধটা তো...এটা তো কোনো জীবিত মানুষের হতে পারে না!

অনিমেষ কম্পিত হাতে তার উরুর সেই ক্ষতটা দেখাল। ডাক্তার মিত্র গ্লাভস পরে জায়গাটা পরীক্ষা করতে গিয়ে শিউরে উঠলেন। তিনি চিমটে দিয়ে ক্ষতটা একটু নাড়াচাড়া করতেই সেখান থেকে একটা সাদাটে লার্ভা বা কীটের মতো কিছু বেরিয়ে এলো। অবিশ্বাস্য! নেক্রোসিস হলেও টিস্যু এভাবে পচে যাওয়ার কথা নয়। আর এই পোকাগুলো...এগুলো তো সাধারণ কোনো প্যারাসাইট নয়। এগুলো ঠিক সেই ধরনের মাছি বা পোকা, যারা মৃতদেহের ওপর বাসা বাঁধে।

অনিমেষ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার মিত্র ব্লাড টেস্ট আর বায়োপসির কথা বললেন, কিন্তু অনিমেষ জানে কোনো টেস্টেই কিছু ধরা পড়বে না। তার মনে হচ্ছে, তার হাড়ের ভেতর মজ্জাগুলো এখন কালো আলকাতরায় পরিণত হয়েছে। সে যখন ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে আসছিল, তখন তার কানে এলো ডাক্তার মিত্র তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলছেন, ঘরটা এখনই স্যানিটাইজ করো। মরা মানুষের গন্ধ কিছুতেই যাচ্ছে না।

পাঁচ.

ফ্ল্যাটে ফিরে অনিমেষ নিজেকে অন্ধকার ঘরে বন্দি করে ফেলল। আলো সহ্য হচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে আলো পড়লে পচনটা আরও দ্রুত ছড়াচ্ছে। সে শার্টটা খুলতেই দেখল, তার পিঠের চামড়া বড় বড় চাঙড়ের মতো খসে কার্পেটে পড়েছে। অথচ কোনো ব্যথা নেই। ব্যথার বোধ হারিয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে বড় আতঙ্ক।

সেদিন রাতে সে আর ঘুমোতে পারল না। তন্দ্রার ঘোরে সে দেখল, তার ঘরের কোণে সেই ম্যানহোলটা ফুটে উঠেছে। সেখান থেকে উঠে আসছে সেই লোকটা। লোকটার মুখটা অর্ধেক নেই, চোয়ালের হাড় বেরিয়ে আছে। লোকটা তার দিকে তাকিয়ে একটা ভাঙা গলায় হাসল। কেমন লাগছে অনিমেষ? চার বছর ধরে ওই অন্ধকারের ভেতর আমি একটু একটু করে পচেছি। তোমার জন্য আমার কোনো ঘৃণা নেই। আমি শুধু চেয়েছিলাম আমার সেই পচনটা কাউকে দিয়ে যেতে। আজ তুমি আমার সেই উত্তরাধিকারী।

অনিমেষ চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু দেখল তার জিভটা ফুলে মুখে আঁটছে না। সে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ড্রেসিং টেবিলের হালকা আলোয় সে দেখল, তার মুখের একদিকের চামড়া ঝুলে পড়েছে। গালের পাশ দিয়ে দাঁতের মাড়ি আর হাড় দেখা যাচ্ছে। তার সুপুরুষ চেহারাটা এখন একটা বীভৎস মুখোশ।

হঠাৎ তার মনে হলো, পেটের ভেতর কিছু একটা নড়াচড়া করছে। তীব্র অস্বস্তিতে সে নখ দিয়ে নিজের পেটটা আঁচড়াতে শুরু করল। চুলকানি নয়, এক ধরনের তীব্র জ্বালা। সে নিজের নখ দিয়ে পেটের নরম হয়ে যাওয়া চামড়াটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল।

কোনো চিৎকার বেরোল না তার গলা দিয়ে। বদলে একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ হলো। তার পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কয়েকটা দলা পাকানো ভিজে ন্যাকড়া আর সেই হাইওয়েতে লোকটার গায়ে থাকা জামার একটা টুকরো। তার শরীর যেন এখন একটা ডাস্টবিন, যেখানে চার বছর আগের সেই অপরাধের সব প্রমাণ একে একে জমা হয়েছে।

ছয়.

পরদিন সকালে অনিমেষ আবিষ্কার করল, সে আর শক্ত কোনো খাবার গিলতে পারছে না। সব খাবারই তার জিভে ঠেকলে মনে

হচ্ছে পচা নাড়িভুঁড়ি। সে আয়নায় দেখল তার একটা চোখের মণি সাদা হয়ে গেছে। পচন এখন মস্তিষ্কের দিকে এগোচ্ছে।

বিকেলের দিকে তার ফ্ল্যাটের বেল বাজল। অফিসের পিয়ন এসেছে কিছু ফাইলে সই নিতে। অনিমেষ দরজা খুলল না। ওপার থেকে পিয়নের আওয়াজ পাওয়া গেল– স্যার? ভেতরে আছেন? কী বিশ্রী গন্ধ স্যার! কেউ কি মারা গেছে ভেতরে?

অনিমেষ দরজার ওপাশ থেকে গোঙাতে গোঙাতে বলল, চলে যাও! আমি অসুস্থ! কিন্তু তার গলার স্বর শুনে পিয়ন ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল স্যার হয়তো স্ট্রোক করেছেন। সে সোসাইটির সিকিউরিটিকে ডাকল।

ভেতরে অনিমেষ তখন উন্মাদ হয়ে গেছে। সে তার বাথরুমের বড় ছুরিটা নিয়ে নিজের শরীরের পচা অংশগুলো কেটে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে। সে ভাবছে যদি পচা মাংসগুলো ফেলে দেওয়া যায়, তবে হয়তো সে মুক্তি পাবে। কিন্তু সে যতই কাটছে, ভেতর থেকে ততই কালচে আঠালো তরল আর পোকা বেরিয়ে আসছে।

তার মনে হলো, তার শরীরের প্রতিটা কোষে সেই লোকটার স্মৃতি ঢুকে গেছে। সে নিজের ডান হাতের কবজিটা টেবিলের ওপর রেখে ছুরি দিয়ে কোপ মারল। হাতটা আলাদা হয়ে মেঝেতে পড়ল, কিন্তু কোনো রক্ত বেরোল না। বিচ্ছিন্ন হাতের আঙুলগুলো মেঝের ওপর পোকার মতো কিলবিল করে নড়তে লাগল।

অনিমেষ হাসতে শুরু করল। এক বিকট, অমানুষিক হাসি। তার সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে নাক আর কান দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল তরল মাংস। সে বুঝতে পারল, সে আসলে মরছে না। মৃত্যু তো অনেক সহজ। তাকে এই পচনশীল শরীরের ভেতরেই বছরের পর বছর বেঁচে থাকতে হবে। এটাই তার বিচার।

সাত.

বাইরে তখন সিকিউরিটি আর প্রতিবেশীদের জটলা বাড়ছে। দরজায় ধাক্কা পড়ছে সজোরে। কিন্তু অনিমেষের কানে সেই শব্দ পৌঁছাচ্ছে না। তার কানে এখন কেবল একটাই শব্দ– হাজার হাজার মাছির ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। তার শোবার ঘরের দেওয়ালগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, প্লাস্টারের ফাটল দিয়ে চুইয়ে পড়ছে সেই কালচে দুর্গন্ধযুক্ত রস।

অনিমেষ মেঝেতে পড়ে ছটফট করছে। তার শরীরের অর্ধেক এখন কঙ্কালসার, আর বাকি অর্ধেকের মাংসগুলো থকথকে কাদার মতো ঝুলে আছে। সে নিজের বাঁ হাত দিয়ে নিজের পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো টেনে বের করার চেষ্টা করল। সে দেখতে চাইল, তার ভেতরে কোনো আত্মা অবশিষ্ট আছে কি না। কিন্তু সেখানে কেবল একরাশ কালো কাদা আর কয়েকটা ছোট ছোট মানুষের দাঁত। সেগুলো কি সেই লোকটার? নাকি তার নিজেরই অপরাধগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে?

হঠাৎ তার মনে হলো, সে একা নয়। এই পচা মাংসের স্তূপের ভেতরেই কেউ একজন কথা বলছে। সে নিজের বুকের খোলা গর্তটার দিকে তাকাল। সেখানে তার হৃৎপিণ্ডটা এখন আর নেই, বদলে একটা ছোট আয়নার মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। সেখানে ফুটে উঠছে সেই চার বছর আগের বর্ষারাতে হাইওয়ের দৃশ্য। কিন্তু এবারের দৃশ্যটা আলাদা। সে দেখছে, গাড়িটা সে চালাচ্ছে না, গাড়িটা চালাচ্ছে সেই মৃত লোকটা, আর চাকার নিচে পিষে যাচ্ছে স্বয়ং অনিমেষ!

না! এটা হতে পারে না! সে চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু তার চোয়ালটা আলগা হয়ে খসে পড়ল মেঝেতে। একটা বিশ্রী শব্দে হাড়টা কার্পেটের ওপর আছড়ে পড়ল।

আট.

বাইরে থেকে দরজা ভাঙার শব্দ এলো। মিস্ত্রি শাবল দিয়ে লকটা ভেঙে ফেলেছে। একদল মানুষ হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল। কিন্তু ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই বমি করে দিল। সেই গন্ধটা বাতাসের নয়, সেটা যেন একটা অদৃশ্য বিষাক্ত গ্যাস যা ফুসফুস জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

পুলিশ অফিসার মণ্ডল মাস্ক পরে ভেতরে ঢুকলেন। টর্চের আলোটা যখন শোবার ঘরে পড়ল, তিনি স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

মেঝের ওপর অনিমেষ নেই। সেখানে পড়ে আছে একটা বিশাল চামড়ার খোলস। ঠিক যেন কোনো সাপ তার খোলস ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু সেই খোলসটা মানুষের আকৃতির। চামড়াটার ভেতর কোনো মাংস নেই, হাড় নেই। শুধু পাতলা একটা স্তূপ।

স্যার, এই দেখুন! এক কনস্টেবল চিৎকার করে উঠল।

টর্চের আলো পড়ল দেওয়ালের বড় আয়নাটার ওপর। আয়নার ভেতরে দেখা যাচ্ছে অনিমেষকে। সে সম্পূর্ণ নগ্ন, তার শরীরটা নিখুঁত, সুন্দর। কিন্তু আয়নার ভেতরের অনিমেষটা হাত বাড়িয়ে ডাকছে। আর তার পায়ের কাছে আয়নার ভেতরেই পড়ে আছে সেই চার বছর আগের মৃত লোকটা। লোকটা এখন হাসছে।

হঠাৎ আয়নার ভেতরের অনিমেষটা নিজের গাল কামড়ে এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিল। তারপর সেটা চিবোতে চিবোতে আয়নার গ্লাসটা নখ দিয়ে আঁচড়াতে শুরু করল। বাইরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা শুনতে পেল কাচের ওপর নখের সেই কর্কশ আওয়াজ।

নয়.

পুলিশ ঘটনার কোনো কিনারা করতে পারল না। ডায়ারিতে লেখা হলো– নিখোঁজ। কিন্তু সেই ফ্ল্যাটটা আর কেউ কোনোদিন ভাড়ায় নিতে পারেনি। প্রতি পূর্ণিমায় সেই সাতাশ তলার বন্ধ ফ্ল্যাটের করিডোর দিয়ে এক অসহ্য পচা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। লোকে বলে, মাঝরাতে নাকি দরজার ওপাশ থেকে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ পাওয়া যায়– আমাকে এখান থেকে বের করো! আমি এখনো মরিনি!

সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটল এক মাস পর। সেই হাইওয়ের ধারের ম্যানহোলটা যখন মিউনিসিপ্যালিটির লোক পরিষ্কার করতে গেল, তারা সেখানে একটা নতুন কঙ্কাল খুঁজে পেল। কঙ্কালটা অদ্ভুতভাবে একটা দামি রোলেক্স ঘড়ি পরা ছিল– যা ঠিক অনিমেষের সেই প্রিয় ঘড়িটার মতো। কঙ্কালটার শরীরে কোনো মাংস ছিল না, কিন্তু হাড়ের খাঁজগুলো থেকে তখনো তাজা পচা মাংসের গন্ধ আসছিল।

অনিমেষ এখন আর কোনো মানুষ নয়। সে একটা চিরস্থায়ী দুর্গন্ধ। সে একটা জীবন্ত পচন, যা কেবল তার নিজেরই যন্ত্রণাকে আস্বাদন করে চলেছে অনন্তকাল ধরে। সে মুক্তি চেয়েছিল মরণে, কিন্তু তার পাপ তাকে উপহার দিয়েছে এক অনন্তকাল ধরে চলতে থাকা– পচনশীল বেঁচে থাকা।

লেখক : গল্পকার ও কবি

কেবিননামা

মহসিন আহমেদ

মুদ্রাজালের ওপারে ফেনায়মান সিরিঞ্জের গান
সুচঘরে বেদনা-বালিকা আলোহীন অন্দরে রবির কোরাসে নৃত্যরত
এইসব সময়ের ভেতর...
দোদুল্যমান মহামানব মুহাম্মদ ও আবু জাহেলের উত্তরাধিকারীগণ

আপনালয়ে পুনরাগমন... অনিশ্চিত ঢেউযাত্রা কাল।

দৃষ্টির ওপারে অপেক্ষমাণ অচেনা আজরাইল
উঁকি দিয়ে ফিরে যায় অমরালয়ের আদিম মিলনায়তনে
জন্ম ও মৃত্যুরহস্য উন্মোচনে ব্যতিব্যস্ত ঈশ্বরের প্রতিনিধিগণ...
মুহূর্তেই কম্পমান কেবিনে ভেসে ওঠে প্রলয়ের প্রতিচিত্র
মগজের ভেতর তড়িৎ গতিতে ঘূর্ণমান ভীতিগ্রস্ত নিউরনসমূহ

ফলে বিশ্বাসী বৃক্ষও অশরীরী হতে নারাজ
অতঃপর, প্রতিটি বিশ্ব সম্মেলনের আগেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধচারীগণ
বিস্তর বর্ণনায় জাতিসংঘে বার্তা প্রেরণ করে....

আষাঢ় আসার খবর রটেছে মেঘে

মাহবুবা ফারুক

আষাঢ়ের খাতায় বৃষ্টির ছন্দে শব্দ
লেখা হয় সুঘ্রাণ, কত রঙের নাম
জল আত্মাহুতি দেয় সৌন্দর্যের কাছে
বেগুনি জারুল লাল কৃষ্ণচূড়া ভিজে
স্বর্ণ পোড়ানো রোদে ঘুমায় শাপলা
রাতের নীরবতায় ঘ্রাণ ঢেলে ক্লান্ত
কামিনী, জুঁই, বেলি, দোলনচাঁপা, আর
যত মায়ামন ফুল ফুটেছিল সাদা
সুখ বর্ষার ছোঁয়া নিয়ে হাসে কদম
চেনা পথে যেতে যেতে চেয়ে দেখি আমি
ফুল কুড়িয়ে হাঁটছি ফুল ধোয়া পথে,
কিন্তু আমি নই অন্য কেউ নতুন কেউ
স্মৃতির ঝাঁপি খুলেছে দু-চার ফোঁটা জল।

বৃষ্টি

মুহাম্মদ ফজলুল হক

টানা তিন দিন ধরে আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নামছে। থামার কোনো লক্ষণ নেই। আষাঢ়ের এই অবিশ্রান্ত বর্ষণে নদী-নালা, খাল-বিল উপচে পানি থইথই করছে। চারদিকের ঘরবাড়ি ভিজে স্যাঁতসেঁতে। মোবারকের কাজে যাওয়ার উপায় নেই। অভাবের জাঁতাকলে পিষ্ট সংসারে অনাহার যেন আরো জেঁকে বসেছে। ঘরে চাল-ডাল নেই বললেই চলে। কেরোসিনের কুপিটাও নিভু নিভু। সামান্য গম আর শিমের বিচি সেদ্ধ করে এবং আটার ঝুরি বানিয়ে বাচ্চাদের মুখে তুলে দিয়ে কোনোরকমে দিন পার করছে মোবারকের স্ত্রী।

বাইরে তখনো ঝমঝম শব্দে বৃষ্টি ঝরছে। ঘরের দাওয়ায় স্তব্ধ হয়ে বসে আছে মোবারক আর শাহিদা। দুজনের চোখেই অন্ধকারের ছায়া। একসময় নীরবতা ভেঙে শাহিদা ফিসফিসিয়ে বলল, "বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বের হও। দেখো, বাচ্চাদের জন্য কিছু জোগাড় করা যায় কি না!" মনে মনে এ কথা ভাবছিল মোবারক। বাজারে বাজারে গিয়ে সে লবণ বিক্রি করত। যা আয় হতো তা দিয়ে সংসার কোনোরকমে চলে যেত। এই দুর্যোগে লবণ নিয়ে কোথায় যাবে সে, তা ভাবতে পারছে না।

এমন সময় বৃষ্টিতে ভিজে জবুথবু হয়ে কবির এসে উপস্থিত হলো। মোবারকের মনে আশার সঞ্চার হলো। সে বুঝতে পারল, নিশ্চয়ই কেউ মারা গেছে। সে খবর দিতেই আসছে কবির। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "ওস্তাদ, ছোট চৌধুরীর মৃত্যু হয়েছে। কবর খুঁড়তে যাইতে হইব।" কবিরের কথা শুনে মুহূর্তের জন্য মোবারকের মন ভালো হয়ে উঠলেও বৃষ্টির কথা ভেবে চুপসে যায় সে। জীবনে এই প্রথম কবর খোঁড়ার কথা শুনে দ্বিধায় পড়ে যায় মোবারক। লবণ বিক্রেতা হলেও কবর খোঁড়ার ডাকে সর্বদাই সে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। গ্রামের কারো মৃত্যু হলে সবার আগে মোবারকের ডাক পড়ে। কিছু প্রাপ্তির আশায় কখনো সে এই কাজ করেনি। কবর খোঁড়াকে পবিত্র জ্ঞান মনে করে। আত্মার শান্তি মেলে। প্রয়োজনীয়

উপকরণ কেনার জন্য অনেকে ভালো টাকা দেয়। সব খরচ হয় না। বেঁচে যাওয়া টাকা নিজেরা ভাগ করে নেয়।

হঠাৎ তার মন বিষণ্ন হয়ে উঠল। বৃষ্টির জন্য বাজারে যেতে না পারায় সে অভাবে পড়েছে বলেই কি ছোট চৌধুরীর মৃত্যুতে তার মন ভালো হয়েছিল? নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পেল। নিজেকে ধিক্কার দেয় সে, ছি মোবারক! "তুমি তো এমন ছিলে না!" বাচ্চাদের মুখ, শাহিদার কষ্ট তার চোখে ভেসে উঠল। সবকিছুর জন্য সে বৃষ্টিকে দায়ী করল। "কিছু কও, ওস্তাদ।" কবিরের কথায় ভাবনায় ছেদ পড়ে। মোবারক দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী কমু কবির, দেখছোস না আকাশটা কেমন ভেঙে পড়ছে!"

খবর শুনে শাহিদা দৌড়ে গিয়ে হাজির হলো চৌধুরীবাড়িতে। নিশ্চয়ই কিছু মিলবে। বৃষ্টির কারণে এলাকার লোকজন আসতে পারছে না। অল্প কয়েক জন বৈঠকখানায় বসে আছে। সে ঘোমটা টেনে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ছোট চৌধুরীর গিন্নির ঘরে প্রবেশ করল। শাহিদাকে দেখে গিন্নি যেন প্রাণ ফিরে পেল। মৃতদেহের পাশে থেকে যে ভয় তার মনে জমেছিল, তা কিছুটা কেটে গেল। শাহিদা কাছে যেতেই তাকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল গিন্নি। তাঁর কান্না দেখে থমকে যায় শাহিদা। তার বুক কেঁপে উঠল। আজ যদি মোবারকের কিছু হতো! ভাবনাটা শেষ করার সাহস পেল না সে। দ্রুত নিজকে সামলে দিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে শাহিদা বলল, "কাইন্দো না বুবু, ধৈর্য ধরো। বেশি বেশি দোয়া করো। দোয়া ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই।"

কিছুটা শান্ত হয়ে চৌধুরী গিন্নি বলল, "এসে ভালো করেছিস বোন, রাত থেকে মাথা একদম কাজ করছে না।"

"তুমি ভেবো না বুবু, আমি যখন আইছি তোমার আর কিছু ভাবতে হবে না।"

"রান্না করা খাবার, আনাজপাতি যা আছে সব নিয়ে যা।" খুশি দেখাল শাহিদাকে। সে গিন্নিকে গোসল করিয়ে, নাক, কান ও গলা খালি করে সাদা কাপড় পরিয়ে দিল। ইতোমধ্যে অনেকে চলে আসে। কেউ কেউ গিন্নিকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। এই ফাঁকে শাহিদা বাড়ি ফিরে এলো। খাবার পেয়ে বাচ্চাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মোবারক ও কবির কবর খোঁড়ার যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে বৃষ্টি মাথায় করে চৌধুরীবাড়ি পৌঁছাল। চৌধুরীর ছোট ছেলে এগিয়ে এসে বলল, "কাকা এসে ভালো করেছ। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।"

মোবারক উদাস কণ্ঠে বলল, "বৃষ্টি তো থামছে না বাবা, ক্যামনে কী করুম বুঝতে পারতেছি না।"

"যেভাবেই হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে কাকা।" এই বলে সে কবর খোঁড়ার প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয়ের জন্য বেশ কিছু টাকা দিল মোবারকের হাতে। অস্বস্তি নিয়ে টাকা গ্রহণ করে কবর খোঁড়ার প্রস্তুতি নিতে তারা ফিরে চলল।

প্রকৃতির নিয়ম আর মানুষের জীবন কখনো থেমে যায় না। বৃষ্টির ধারা আরো বাড়ল। নৌকাযোগে তারা কবরস্থানের উদ্দেশে রওনা দিল। বৃষ্টি, ঝোড়ো বাতাস আর নদীর উত্তাল ঢেউ উপেক্ষা করে নৌকা এগিয়ে চলল কবরস্থানের দিকে। বিল পেরিয়ে নৌকা যখন নদীতে পড়ল, ঢেউয়ের তালে নৌকা দুলতে লাগল। বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ঢেউকে পেছনে ফেলে তারা কবরস্থানে পৌঁছাল।

এদিকে শাহিদা ঘরের কাজ সেরে আবার চৌধুরীবাড়ি ছুটে গেল। সেখানে তখন মাতম। বাড়ি ভর্তি মানুষ। মহিলারা গিন্নিকে ঘিরে রেখেছে। বৈঠকখানার ভেতর চৌধুরীর শবদেহ গোসল করানো হয়েছে। সাদা কাপড়ে মোড়া শবদেহও বৃষ্টির ছটায় ভিজে গেছে। মানুষের আনাগোনায় ঘর-বাহির কাদায় মাখামাখি। আশ্চর্যের বিষয়, এত বৃষ্টির মাঝেও কারো মুখে বৃষ্টি নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত। মনে হয় কোথাও বৃষ্টি নেই। প্রকৃতির সব নিয়ম স্বাভাবিকভাবে চলছে।

প্রবল বৃষ্টির ধারা যেন আকাশ ফুঁড়ে নেমে আসছে। বৃষ্টির বাধায় মোবারক থেমে যাওয়ার মানুষ নয়। কবর খোঁড়া তার কাছে শুধু কাজ নয়, পবিত্র দায়িত্ব। মানুষের আস্থাও রয়েছে তার ওপর। দিন-দুপুর, সকাল-বিকাল, সন্ধ্যা-রাত্রিতে কবর খোঁড়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে মোবারকের। মাঝে মাঝে বৃষ্টিতেও সে কবর খুঁড়েছে। এমন একটানা বৃষ্টির মধ্যে কখনো পড়েনি। আজকের মাটি যেন শত্রু হয়ে উঠেছে। কোদালের প্রথম আঘাতেই বোঝা গেল, মাটি আর মাটি নেই পুরোটা কাদা আর পানির মিশ্রণ। প্রতি কোপেই মাটির সঙ্গে পানি উঠে আসছে। আরেকটু কাটার পর পাশের দেওয়ালের মাটি ধসে পড়ছে। কাদা মাখা পা গর্তের ভেতর থেকে তুলতেই কষ্ট হচ্ছে। কারো পা হঠাৎ পিছলে যাচ্ছে, কেউ হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবে যাচ্ছে। বৃষ্টির পানি কপাল বেয়ে চোখে ঢুকে কিছুই দেখা যায় না। কাদা, পানি আর বৃষ্টিতে ভেজা তাদের ক্লান্ত শরীর থেকে যেন ঘাম ঝরছে। তবু কোদাল থামছে না। তারা ক্লান্ত কিন্তু অবসাদমুক্ত।

হঠাৎ গর্তের এক পাশ ধসে পড়ে। মুহূর্তেই কোমর পর্যন্ত পানি জমে যায় গর্তে। কেউ হাঁপাতে লাগল, কেউ ক্লান্ত হয়ে কোদালে ভর দিল। মোবারক বুঝল এভাবে কবর কখনোই তৈরি হবে না। সে চিৎকার করে বলল, "মাটি কাটা বন্ধ কর!"

তার মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল। সে বাঁশ কেটে একটি বড় খাঁচা তৈরি করতে বলল। বৃষ্টির মধ্যেই তারা দ্রুত বাঁশ কাটতে লাগল। বাঁশ কাটতে কাটতে হাত কেটে গেলেও তারা অল্প সময়ের মধ্যে কবরের মাপে বাঁশের খাঁচা তৈরি করল। খাঁচা গর্তের ভেতর নামাতে গিয়ে কারো পা পিছলে গেল। কাদা ছিটকে চোখে-মুখে ঢুকে গেল। তবু তারা দমল না। সবাই মিলে খাঁচাটি শক্ত করে মাটিকে পুঁতল যেন চারপাশের কাদা-মাটি ধসে না পড়ে।

তারপর শুরু হলো আরেক যুদ্ধ। খাঁচার ভেতর জমে থাকা পানি আর কাদা তোলা। বালতি দিয়ে পানি তুলছে, হাতে কাদা ছুড়ছে, আবার পানি ঢুকছে। যেন শেষই হয় না। তবু ধীরে ধীরে গর্তের তলা দেখা দিতে লাগল। অবশেষে তারা কবরটি মোটামুটি প্রস্তুত করে নিঃশ্বাস ফেলে স্বস্তি পেল। বৃষ্টি না থামলেও অদ্ভুত প্রশান্তি নিয়ে তারা লাশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

দুপুর হয়ে গেলেও বৃষ্টির তোপে সূর্য যেন অদৃশ্য। প্রকৃতি সূর্যকে আড়াল করে রাখতে পারলেও বৃষ্টি মানুষকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সারা গ্রামের মানুষ জড়ো হয়েছে চৌধুরীর জানাজায় অংশ নিতে। বৃষ্টি আর মানুষের ঢল একাকার হয়ে জানাজা শেষ হলো।

বৃষ্টিতে মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছুই হয়নি।

জানাজা শেষে সবাই চলে গেলেও কিছু মানুষ থেকে গেল শবযাত্রায় অংশ নিতে। শব নিয়ে তারা নৌকাঘাটে যায়। নৌকায় শবদেহ তুলে রওনা হয় কবরস্থানের দিকে। পাশাপাশি কয়েকটি নৌকা ছুটে চলে। মনে হয় শবদেহকে স্যালুট করতে করতে মার্চ করে চলছে সৈন্যদল। বৃষ্টি যেন হেসে উঠেছে শবযাত্রা দেখে। সে তার ধারা আরো বাড়িয়ে দিয়ে শবযাত্রায় শামিল হয়।

চৌধুরীবাড়ির উঠানে দানের হাট বসে। বস্তা বস্তা ধান-চাল ও নগদ টাকা বিতরণ করা হচ্ছে। বৃষ্টির কারণে যারা তিন দিন কাজে যেতে পারেনি, যাদের চুলায় আগুন জ্বলেনি সবাই ভিড় করেছে এখানে। শোকের মাঝে এমন দান মানুষকে সুখী করছে।

অদ্ভুত এক দৃশ্য! একজনের মৃত্যু শত মানুষের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করে দিল। মুহূর্তেই তাদের বুকের ভেতর জমে থাকা অনাহারের কষ্ট দূর হয়ে গেল। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে, কাদামাখা পায়ে, হাসিমুখে তারা ফিরে যেতে লাগল।

শাহিদাও পিছিয়ে থাকল না। এই বাড়িতে কাজ করার সুবাদে ও মোবারকের পরিচয়ের কারণে গিন্নি তাকে আলাদা করে ডেকে নিল। শাড়ি, চাল-ডাল, নানান খাদ্যসামগ্রীসহ কিছু টাকা তার হাতে তুলে দিল। ভেজা আঁচলে বারবার চোখ মুছতে মুছতে শাহিদা বারবার চৌধুরীবাড়ি ও নিজের বাড়িতে যাতায়াত করতে লাগল। বৃষ্টি আর পায়ে লেগে থাকা কাদা তার আসা-যাওয়ায় কোনো বাধা হতে পারল না।

প্রচণ্ড ঢেউ আর তুমুল বৃষ্টি কোনোভাবেই শবযাত্রা রুখতে পারেনি। শবদেহ নিয়ে নৌকা আপন গতিতে এগিয়ে চলে পৌঁছে যায় কবরস্থানে। মোবারক যেন এই অপেক্ষায় ছিল। সে নতুন করে কবরের ওপর পলিথিন ধরে দ্রুত পানি তুলতে বলল। পানি তুলতে সময় লাগল না। বৃষ্টি ও ঝোড়ো বাতাসের কথা ভুলে তারা সসম্মানে শবদেহ দাফন করল।

দাফন শেষ হতেই নিজেকে ভারমুক্ত মনে হলো মোবরকের। নীরবে ভিড় থেকে সরে গিয়ে সে ধীরে ধীরে নদীতে নামল। যখন মোবারক নদীর পানিতে ডুব দিল, তখন ওপর থেকে পড়া বৃষ্টির ফোঁটা তার কানে এক অদ্ভুত চেনা সুর তুলল। মুহূর্তে মোবারক তার শৈশবে ফিরে গেল। সব ক্লান্তি ভুলে মনের আনন্দে সেই সুরের তালে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ডুবসাঁতারে মগ্ন হয়ে রইল। তার মনে হলো "বৃষ্টি, মৃত্যু আর জীবন সব একই চক্রের অংশ। এই চক্র মানুষের জীবন থামালেও জীবনের চলা থামাতে পারে না।"

দাফন শেষে সবাই যে যার ঘরে ফিরে গেল। প্রকৃতিতে তখনো বৃষ্টি ঝরছে। সেই বৃষ্টি আর কারো জীবনে কোনো বাধা হয়ে রইল না। ধারাবাহিক বৃষ্টির মধ্যেও সবকিছুই চিরচেনা নিয়মে সচল হয়ে উঠল।

লেখক : শিক্ষক, ভৈরব সরকারি মহিলা কলেজ

myGov
এক ঠিকানায় সরকারি সেবা

বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

বিজ্ঞাপন এজেন্সি তালিকাভুক্তির আবেদন

সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্য

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- বিজ্ঞাপনী সংস্থার হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স*
- প্রতিষ্ঠানের টি.আই.এন (TIN) সনদ*
- প্রতিষ্ঠানের বি.আই.এন (BIN) সনদ*
- প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট (VAT) রেজিস্ট্রেশন সনদ*
- স্বত্বাধিকারী/স্বত্বাধিকারীগণের জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি *
- প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ব্যাংক সনদ/ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র *
- যেসব সংস্থার সাথে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে দুটি সংস্থার প্রত্যয়ন পত্র*

সেবার ফি

বিনামূল্যে

সেবা প্রদানের সময়সীমা

৭ কার্যদিবস

আবেদন ফরম পূরণের নিয়মাবলী

১. আবেদন ফরমের লাল তারকা (*) চিহ্নিত ঘরগুলো অবশ্যই পূরণ করুন। অন্যান্য ঘর পূরণ ঐচ্ছিক।
২. আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে প্রয়োজন হলে সংরক্ষণ করা যায় এবং পরবর্তীতে সেবা ব্যবস্থাপনা অপশন হতে ড্রাফট আবেদন পুনরায় শুরু করা যাবে।
৩. আবেদন দাখিলের পর প্রতিটি আবেদনের জন্য একটা স্বতন্ত্র ট্র্যাকিং নম্বর প্রদান করা হবে, যেটি ব্যবহার করে সেবা ব্যবস্থাপনা অপশন হতে আবেদনের অগ্রগতি জানা যাবে।

সেবাটি পেতে প্রবেশ করুন এই লিংকে
https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1712031764

শিশু-কিশোর পাতা

তরুপল্লব

ছবি: নীলা আহসান, আশাশুনি, সাতক্ষীরা

এলো আষাঢ় মাস

আবদুল লতিফ

ফুটল বেলি কদম কেয়া
আকাশ জুড়ে ডাকছে দেয়া
এলো আষাঢ় মাস।

ট্যাংরা পুঁটি খলশে হাসে
শিং মাগুরও নাচে পাশে
জলে ভাসে হাঁস।

রিমঝিম ঝিম বৃষ্টি পরে
উঠোন বাড়ি কাঁদায় ভরে
আষাঢ় মাসের রূপ।

গাঁও-গেরামের ছেলেপুলে
নাওয়া খাওয়া সময় ভুলে
খেলায় মজে খুব।

নদীনালা পুকুর ডোবা
থইথই জল বাড়ায় শোভা
নৌকা বাঁধা ঘাটে।

করতে রোপণ আমন চারা
জাগল সারা পাড়া পাড়া
ব্যস্ত সময় কাটে।

বর্ষার অপরূপ প্রকৃতি

শারমিন নাহার ঝর্ণা

নীল আকাশে মেঘের ভেলা লুকোচুরি খেলে
টাপুর টুপুর বৃষ্টি নামে মেঘের পরশ পেলে,
সবুজ ঘাসে জলের ছোঁয়া সজীব করে প্রাণ,
বৃষ্টির দিনে ভালো লাগে পাখপাখালির গান।

হলুদ রঙের কদম ফুলে মিষ্টি সুবাস ছড়ায়
নদীর বুকে ঢেউয়ের খেলা মন খুশিতে ভরায়,
ঝুম ঝুমা ঝুম বৃষ্টি নামে ছুঁয়ে যায় প্রাণ,
পাতার ফাঁকে মুক্তোর দানা ঝরে অবিরাম।

নৌকা ভাসে নদীর বুকে মাঝি গায় গান
পাখির মিষ্টি কলতানে ভরে যায় যে প্রাণ,
মাটির গন্ধ ভেসে আসে মনটা উদাস হয়
বৃষ্টির সুরে উদাস মনটা কত কথা কয়!

বর্ষার রূপে মুগ্ধ হয় অবাক চেয়ে রই
চারিদিকে বৃষ্টির পানি করে যে থইথই,
বর্ষা এলে প্রকৃতিটা নতুন রূপে সাজে
টিনের চালে বৃষ্টির ফোঁটা গানের সুরে বাজে।

হুলুস্থুল

আলমগীর হোসেন

বৃষ্টি ফোঁটার পরশ পেয়ে
ফুল বনে ফুল ফুটল ওই,
তরতরিয়ে কদম গাছে
দস্যি ছেলে উঠল ওই।

গাছের নিচে ভিড় জমে যায়
কাড়াকাড়ি হট্টগোল!
বৃষ্টি পেয়ে হলদেটে ফুল
হাওয়াতে খায় দোদুল দোল।

বৃষ্টি এসে দেয় বাধিয়ে
ফুলের বনে হুলুস্থুল,
হাতে হাতে শোভা পাচ্ছে
বৃষ্টিভেজা কদম ফুল।

সবুজ গোয়েন্দা মিকু

সাধন সরকার

মিকুর চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। কোনো কিছুই তার চোখ এড়িয়ে যায় না। কিছু একটা গরমিল মনে হচ্ছে মিকুর। তার মন বলছে, চারপাশের বন্ধুরা ভালো নেই! মিকুর আন্দাজ সত্য হলো! পাশের এলাকার রাস্তায় গাছ পড়ার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। এই দৃশ্য দেখে মিকুর মন খারাপ। গাছপালা, নদী, পশুপাখিসহ যাবতীয় প্রাণ-প্রকৃতি মিকুর বন্ধু। কিন্তু এবার সেই অক্সিজেন বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। রাস্তার ধারে বড় বড় রেইনট্রি গাছগুলো অনেকদিন ধরে মরে শুকিয়ে আছে। যেকোনো সময় রাস্তার ওপর পড়ে যেতে পারে। একটি দুটি গাছ নয়, অনেক গাছ। সারিবদ্ধভাবে শুকিয়ে মরে পড়ে আছে। বন বিভাগ থেকে জানান হয়েছে, এতগুলো গাছের মৃত্যুর কারণ উদ্‌ঘাটন করার পরই গাছগুলো কাটা হবে। মাস পেরিয়ে বছর। কিন্তু গাছগুলো ওভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। কবে কাটা হবে কেউ জানে না! এলাকার মানুষ ডাল ও গাছ উপড়ে পড়ার ভয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে। মিকু ভাবল, এই সমস্যার দ্রুত সমাধান দরকার। মিকু খুব শান্ত স্বভাবের। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলে না। কিন্তু পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার দিক দিয়ে তার ধারেকাছে কেউ নেই। কাঁধে সব সময় একটা সবুজ ব্যাগ থাকে। এই ব্যাগে থাকে আতশ কাচ, নোটবুক, দুরবিন আর একটি ছোট বাঁশি। আরো একজন সঙ্গে থাকে। তার প্রাণের বন্ধু পোষা টিয়া মিঠু। গাছের মৃত্যুর কারণ কী? এ প্রশ্ন এখন এলাকা জুড়ে।

মিকু গাছগুলোর কাছে গেল। প্রাণহীন কয়েকটি গাছকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরল। তিলে তিলে অক্সিজেনের এই বড় বড় ফ্যাক্টরিগুলোকে মেরে ফেলা হয়েছে। মিকু ব্যাগ থেকে আতশ কাচ বের করে মাটি পরীক্ষা করল। একেকটি গাছের কাছে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য নোটবুকে লিখে রাখল। বেশ কয়েক দিন ধরে চলল এই গোয়েন্দাগিরি! মিকুর এই অতি উৎসাহী ও কৌতূহলী কাণ্ডকারখানা দেখে সচেতন কেউ কেউ মিকুর সঙ্গে যোগ দিল। মিঠু বলল, 'কিছু ক্লু পেলে।' মিকু চুপ করে রইল। চোখ ছলছল। কোনো জবাব নেই। মিকু মিঠুকে বলল, 'সময়মতো নজরে এলে হয়তো গালগুলোকে বাঁচানো যেত।' মিঠু কৌতূহলী হয়ে আবার বলল, 'কারণ উদ্‌ঘাটন করতে পারলে কি?' মিকু মাথা নাড়ল। এলাকাবাসী দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে মিকুর কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছে। একজন তো বলেই ফেলল, 'এতসব করেও এবারও কিচ্ছু হবে না।' কিছু লোক মিকুর এই কাজে উৎসাহ দিল। মিকু তার গোয়ান্দগিরির রিপোর্ট জমা দিল দপ্তরে। সপ্তাহ না ঘুরতেই প্রাণহীন মরা গাছগুলো কাটা শুরু হলো। এলাকাবাসী বিস্মিত হয়ে গেল! সব মরা বিশাল বিশাল গাছ কাটা হলো। এটাই চেয়েছিল গ্রামবাসী। কর্মকাণ্ড এখানেই থেমে থাকল না। মিকুর রিপোর্ট বলে কথা! যে কয়টি মরা গাছ কাটা হলো তার ডাবল গাছ সেখানে রোপণ করা হলো। এলাকাবাসী স্বাচ্ছন্দ্যে রাস্তা দিয়ে আবার চলাচল শুরু করল। মিকুর রিপোর্টে লেখা ছিল– 'জীবন্ত গাছ জীবনের জন্য অনেক বেশি মূল্যবান। তবে মৃত গাছ তার চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। ছত্রাকের আক্রমণে গাছগুলো টিকে থাকতে পারেনি। অপরদিকে মাটিতে লবণাক্ততা আর চারপাশের কংক্রিটের আস্তরণ এই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে। একটি গাছ কাটার বদলে দুটি গাছ লাগালেই সমস্যার সমাধান হবে। আমরা ভেবে নেব– গাছগুলো মরেনি, স্থান পরিবর্তন করেছে।...।'

মা আমার মা

নকুল শর্ম্মা

মায়ের মতো এত আপন
নেইকো জগৎ জুড়ে,
বক্ষ কোমল শীতলপাটি
দুঃখ পালায় দূরে।
আসুক যত বিপদ বাধা
তুমিই আছো ঠাঁই,
আসনপাতা বিশ্ব ভুবন
আঁচলখানি পাই।
সকাল-সাঁঝে প্রতি কাজে
হাসির রেখা মুখে,
লক্ষ্মীমন্ত নারীরূপে
তবু থাকো সুখে।
কষ্ট বুঝতে পাই না কিছুই
বসে তোমায় ছায়ে,
রাজার রাজ্য নাই-বা পেলাম
স্বর্গ তোমার পায়ে।
শতেক বাধা যাই পেরিয়ে
একটুও নেই ভয়,
নিত্য নতুন কাজে যদি
তোমার আশিস রয়।

ছন্দে আনন্দে

জেবুন্নেছা মুনিয়া

একটি পাতার সবুজ রঙে
জাগলো খুশীর রোল,
রঙ লেগেছে শিরায় শিরায়
ভীষন কলরোল।
রোদের সাথে ছায়ার খেলায়
মেঘ দিয়েছে সাথ,
বৃষ্টি বলে আমি তবে
রাখবো কেন বাঁধ!
অঝোর ধারায় ঝরতে দিও
সকাল দুপুর সাঁঝে,
মন খারাপের ক্ষণগুলো সব
ভরুক ধূসর সাজে।
বৃষ্টি নামুক আকাশ জুড়ে
সবুজ পাতার বাড়ি,
রোদের সাথে ঝগড়া ভীষণ
দারুণ রকম আড়ি।
তাই বুঝি ওই মেঘবালিকা
অভিমানের তোড়ে,
মেঘগুলোকে সঙ্গী করে
আকাশ ভেঙে ঝরে।
একটি পাতার সবুজ রঙে
ডাকলো খুশীর বান,
বৃষ্টি এল চমকে দিতে
ভরিয়ে দিতে প্রাণ।

বর্ষাকালে

মেহেদী হাসান মামুন

বর্ষাকালে পুবাল বাতাস
পালে লাগে হাওয়া,
বর্ষাকালে কুলবধূর
সাধের নাইওর যাওয়া।

বর্ষাকালে টিনের চালে
বৃষ্টির রিমঝিম,
বর্ষাকালে খেতে ভালো
খিচুড়ি আর ডিম।

আষাঢ়-শ্রাবণ দুমাস জুড়ে
চলত প্রবল ধারা,
ভাবুক কবির উদাস মনে
পড়ে যেত সাড়া।

জলবায়ুর বিপর্যয়ে
বর্ষা এখন ফাঁদে,
কালো মেঘে আকাশ কাঁদে
বিপুল আর্তনাদে।

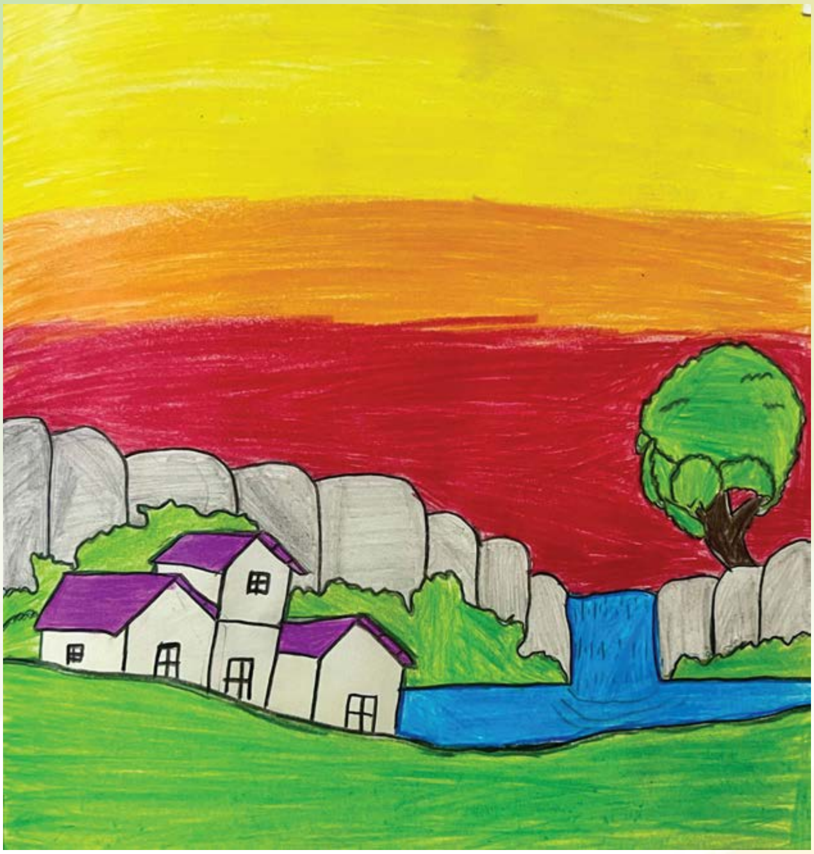

ছবি
মুহাম্মদ জুহাইম জামান
৫ম শ্রেণি
ধানমন্ডী গভ: বয়েজ স্কুল

ছবি
রোকাইয়া ইসলাম
৭ম শ্রেণি
আজিবর বালি হাইস্কুল
মাদারীপুর

আপলোডে কোলাব্যাঙ

এস এম তিতুমীর

বর্ষাকাল, ঝুম বৃষ্টির দিন। সাফিদের ছাতা না হলে চলেই না। রাস্তায় আছাড় খায়নি এমন নয়, সে দুষ্টুমিষ্টি অভিজ্ঞতা এ পাঁচ বছরের পুঁচকের এরই মধ্যে হয়েছে। একদিন ইশকুলে বেরিয়ে মিনিট তিনেকের মধ্যে ঘরে ফিরে এলো। 'কি রে সাফিদ এত জলদি এলি যে,' রান্নাঘর থেকে মা এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এসে দেখে ওর ইশকুল ইউনিফর্ম কাদা-পানিতে সয়লাব। ছাতার ডাঁটিটাও ভেঙে গেছে। এবার মায়ের খেদ উক্তি– 'বারবার আছাড় খাবি, ছাতা ভাঙবি আর আমাকে কিনে দিতে হবে, তোকে নিয়ে আর পারি না, কাল থেকে তোর ইশকুল যাওয়া বন্ধ।' সাবিনা মণি, মা তো, মুখে যা-ই বলুন না কেন, অন্তরে সন্তানের জন্য মমতা অফুরান। তাই তড়িঘড়ি ওয়ার্ডরোব থেকে নতুন আরেকটি ইউনিফর্ম নিয়ে সাফিদকে তা পরিয়ে ইশকুলে পাঠাল। 'যা বাবা এবার তাড়াতাড়ি ইশকুলে যা, তা না হলে দেরি হয়ে যাবে, ভাগ্যিস! আগে থেকে আরেকটা কেনা ছিল,' এই বলতে বলতে মা আবার ঘরকন্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আষাঢ়ে-আকাশ। মেঘেদের লুটোপুটি, খুনশুটি, দমে-দমে ছুটে চলা, ডোবা-নালায় নেমে আসা, শুকনো দিঘির ধার ঘেঁষে বেড়ে ওঠা কলমিলতার সঙ্গে সখ্য গড়া, বুকে তুলে ভাসিয়ে রাখা, এসব উদারতা মাঝে আরো উদার হয় সাফিদের রং খেলা। মাত্র দুটাকা দিয়ে কেনা হাজার পাওয়ারের রং। প্যাকেটে সামান্যই থাকে কিন্তু অনেক পানি রাঙাতে পারে। ইশকুল ছুটির পর সাফিদ আর বন্ধুরা মিলে রাস্তার পাশে টোপাপানা ভরা যে পুকুর তার ধারে বসে পড়ে। একজন বাঁশের ছোট্ট একটা বাতা কুড়িয়ে এনে তা দিয়ে পানাগুলো একটু দূরে সরিয়ে দেয়। এবার। অনেকটা জায়গা পরিষ্কার, কাকা-চোখের মতো পানি। তাতে ঢেলে দিলো সেই রং, অদ্ভুত তো, অনেকটা জায়গা জুড়ে সে রং ছড়িয়ে গেল। লাল রং, তাই দেখতেও স্পষ্ট। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে, প্রথমে ঘন লাল, পরে হালকা, তারপর আরো হালকা আর এক সময় তা শেষ। তবে যতক্ষণ শেষ না হয় ততক্ষণ বসে থাকা।

'কি রে সাফিদ, বাড়ি যাবি না? না গেলে থাক, আমরা গেলাম। তুই বসে বসে রং খেলা দ্যাখ, আমরা গেলাম।' সাফিদের চোখ সরে না সেই পানি থেকে। হঠাৎই দ্যাখে, কয়েকটা ছোট মাছ সেই লাল পানিতে এসে খেলা করছে। বাহ্! দারুণ তো! এই বলতে বলতে আরো কয়েকটা বড় মাছ। সাফিদের বিস্ময়দৃষ্টি আরো বড় হলো। লাল পানিতে মাছগুলোকে তো খুব দেখাচ্ছে, বেশ রঙিন। মনে হচ্ছে অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছ। কিন্তু আকাশ ডাকতেই ওরা তলিয়ে গেল! তাহলে কি মেঘের গর্জনে ওরা ভয় পায়। আবার কিছুক্ষণ পর ওরা এলো। এবার ওদের সঙ্গে এসেছে বড় হলুদ রঙের কোলা-ব্যাঙ। দারুণ! হলুদটা লালে মিশে একটা কেমন যেন অরেঞ্জ কালার হয়েছে। হতে পরে পানির কারণে এমন হচ্ছে। কিন্তু দেখতে সুন্দর। ব্যাঙটা মাছেদের মাঝে থেকে মাঝে মাঝে আলাদা হয়ে পাড়ের কাছে চলে আসছে। হয়তো একলাফে ঝোপে পড়বে। না, সাফিদ তা হতে দিচ্ছে না। 'থাক না বাবা, আরেকটু পানিতে থাক, তোর তো সর্দি লাগার ভয় নাই।' এভাবে ব্যাঙটার পথ সাফিদ অনেকক্ষণ ধরে রেখে একটা বুদ্ধি মাথায় এলো। 'আচ্ছা, তোকে বাড়ি নিয়ে গেলে কেমন হয়।' যেই বুদ্ধি সেই কাজ। কিন্তু

কীভাবে ধরবে তার বুদ্ধি মাথায় নাই। কোলা-ব্যাঙ খুব লম্বা লাফ দিতে পারে। আর ওর গা বেশ পিচ্ছিল। কী করা যায়, বুদ্ধি খুঁজতে খুঁজতে, আইডিয়া! একটা বুদ্ধি মাথায় এলো। পলিব্যাগে রঙিন পানি ভরে তা একটা কাঠির সাহায্যে আস্তে আস্তে ডোবার পানিতে মিশিয়ে ব্যাঙের কাছে নিয়ে যায়। ব্যাঙটা ওই পলির মধ্যে ঢুকলেই তার মুখ বন্ধ করে ইশকুল ব্যাগে বাড়ি নিয়ে গেলেই হলো। ব্যস! কাজ শেষ। আর হলোও তাই। সাফিদের বাড়ি ফিরতে এদিকে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মা তো রেগে ফায়ার!

–কি রে কোথায় ছিলি এতক্ষণ, বলি কোন কামাইয়ে ব্যস্ত ছিলি এতক্ষণ, বাড়ি আসার নাম নাই!

–না মা, মানে, ওই ডোবা, ওই ডোবা!

–হয়েছে আর ডোবা ডোবা করতে হবে না। যা, জলদি ফ্রেশ হয়ে খেয়ে নে।

সাফিদ দ্রুত ঘরে গেল, কিন্তু ব্যাঙের কী হবে। খুব ধীর পায়ে সবার অগোচরে অ্যাকোয়ারিয়ামে ব্যাঙটাকে ছেড়ে দিল। সেখানকার বাসিন্দারা নতুন অতিথি পেয়ে খুশি হলেও তা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি। কেননা অতিথি খুব চঞ্চল, শুধু ফাল পাড়ে। সাফিদের ঘরে সাফিদের এ কাণ্ড মা খেয়ালই করেনি। সাফিদ ফটফট দুটো নাকে-মুখে ঠুঁসে দিল ছুট ঘরে। গিয়ে দেখে ব্যাঙটা খুব লাফালাফি করছে। কয়েক বার ওপরের ঢাকনা ওলটানোরও উপক্রম হয়েছে কিন্তু ভাগ্য ভালো ওলটায়নি। তাই সাফিদ ওটার ওপর একটা ভারী মোটা বই চাপিয়ে দিল। ব্যাঙটাকে নিয়ে অনেক চিন্তা অনেক স্বপ্ন। ও একসময় পোষ মানবে, এখানে থাকবে, ওর সঙ্গে খেলা করবে। মার থেকে ওকে সব সময় লুকিয়ে রাখবে, বন্ধুদের দেখাবে, বন্ধুত্ব করিয়ে দেবে আরো কত কি! কিন্তু বন্ধুদের বাড়ি না এনে ব্যাঙটাকে দেখানো যায় কীভাবে, তার উপায় দরকার। অনেক চিন্তাভাবনা করে উপায় এলো, সেলফি। হ্যাঁ, ব্যাঙটার একটা ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জারে পাঠালেই তো হয়। আরে রীতিমতো হইচই পড়ে যাবে। কিন্তু মোবাইল ক্যামেরা, হ্যাঁ বাবারটা নিলেই তো হয়। বাবার মোবাইল ফোনটা এনে প্রথমে অ্যাকোয়ারিয়ামের কাছে কাচের কাছাকাছি গিয়ে ব্যাঙটার একটা ছবি তুলল, বাহ্ দারুণ হয়েছে তো! এবার তাহলে একটা সেলফি হয়ে যাক, এই বলে একটা সেলফি হলো। তা আপলোডও হলো। এবার সাফিদ নিশ্চিন্ত। 'যাক বাবা, ব্যাঙটার একটা ছবি তো তোলা হলো, বন্ধুদের দেওয়া হলো, দেখি ওরা কী বলে। বন্ধুদের কাছে ব্যাঙের কথা কাল শুনব।

'আচ্ছা, ব্যাঙেরা কি অন্ধকার ভালোবাসে? দেখসি বাবা, আমার অন্য শখের মাছগুলোকে আবার খেয়ে ফেলিস না, আমি কিন্তু লাইট অফ করে দিচ্ছি।' ব্যাঙের সঙ্গে খেলতে খেলতে কখন রাত হয়ে গেছে সাফিদ বুঝতেই পারেনি। গভীর ঘুম, হালকা পানির ছিটা, ঠান্ডা হাওয়া, বেশ ভালো একটা স্বপ্নিল সময়। তবু সাফিদের মুখ যেন ঝিরিঝিরি পানিতে ভিজে যাচ্ছে। ঘুম ভেঙে গেল। সকাল হয়ে গেছে, কিন্তু ওই ঝিরঝির পানি এলো কোথায় থেকে এই প্রশ্ন মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাকিয়ে দ্যাখে জানালা খোলা, মেঝেতে তখনো দু-তিনটে মাছ ছটফট করছে বাঁচার আশায়। তাদের দেখে তাড়াতাড়ি তুলে জগের পানিতে রাখলো অ্যাকোরিয়ামের ঢাকনাটা মেঝেই পড়ে ভেঙে গেছে। 'আরে আমার ব্যাঙ! ও কোথায়?' এবার সাফিদের চোখ কপালে। তাই তো ওই ব্যাঙই তো সব তছনছ করেছে, অ্যাকোয়ারিয়ামে চাপানো বই-টই উলটিয়ে ও লাফ দিয়েছে। এদিক-ওদিক রাস্তা না পেয়ে একলাফে জানালা দিয়ে ও পেয়েছে ওর জলের জগৎ, ওর জাতির জগৎ। সত্যিই তো, ও তো ওখানেই সুন্দর। 'পালিয়ে ভালোই করেছ ব্যাঙ, ভালো থেকো। আবার দেখা কোরো। তোমার ছবি আমার কাছে থাকল, আমার মনে থাকল। তুমি প্রকৃতিকে ভালো রেখো। শুভ বিদায়।'

ছবি
হুমায়রা ইমরোজ
৮ম শ্রেণি
মুহাম্মাদীয়া আলীয়া মাদ্রাসা
মিরপুর, ঢাকা

বর্ষাকাল

এ কে এম মোস্তফা

মেঘলা আকাশ থমথমে ভাব
যায় না দেখা সূর্যটারে
বৃষ্টি পড়ে ঝমঝমিয়ে
অঝোরধারায় মুষলধারে।

পাতার ফাঁকে পাখিগুলো
ভিজছে ওরা বসে বসে
মাথাল পরে গাঁয়ের কৃষক
লাঙল দিয়ে জমি চষে।

আকাশভাঙা বৃষ্টি পড়ায়
সব জলাশয় যায় যে ভরে
ব্যাঙগুলো তাই মহানন্দে
কোরাস গায় আর ফুর্তি করে।

কলাপাতা মাথায় দিয়ে
গরু নিয়ে রাখাল ছোটে
কদম বেলি গন্ধ ছড়ায়
যদিও তা রাত্রে ফোটে।

আষাঢ়-শ্রাবণ এ দুই মাসে
প্রকৃতির হয় এমন হাল
এটাই হলো বাংলাদেশের
ষড়ঋতুর বর্ষাকাল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অপু বড়ুয়া

রবি মানেই আলোর প্রতীক আলোয় আলোয় ভরা
যে আলোতে আঁধার ভেঙে আলোয় হাসে ধরা।
একটি রবি ভুবন রাঙা থাকে আকাশ পাড়ে
আরেক রবি ভালোবাসায় অযুত হৃদয় কাড়ে।
এই রবিটা ঠাকুরবাড়ির জোড়াসাঁকোর ছেলে
এমন রবি কোটির মাঝে একটাও না মেলে।

রবি থেকে হলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তার ছায়াতে ম্লান হয়ে যায় অশ্বত্থ বট পাকুড় ।
তার আলোতে পরান জুড়ায় মন হয়ে যায় ভালো
তার কবিতা ক্লান্তি ঘোচায়, ঘোচায় মনের কালো।
তার গানেরই স্নিগ্ধ সুরে শান্তিতে মন ভরে
রবি ঠাকুর বসত করেন হাজারো অন্তরে।

রবীন্দ্রনাথ রবি ঠাকুর বিশ্বকবি তিনি–
তাঁর কাছে সব বাংলাভাষী সারা জীবন ঋণী।

আমি ফুল

মাহমুদা সিদ্দিকা

আমি শিশু ফুলকলি
বাগানের ফুল
খুব ভোরে গান গাই
পাখি বুলবুল।

আমি নদী বয়ে চলি
টলোমলো ঢেউ
রোজ কাঁদি ডুবো জলে
জানে না তো কেউ।

আমি তারা ঝিকিমিকি
রাতের আকাশে
আমি চাঁদ ঘুরে ঘুরে
থাকি তার পাশে।

আমি মেঘ আষাঢ়ের
ভেজা ভেজা মাটি
আমি শিশু খালি পায়ে
টিপটিপ হাঁটি।

বর্ষার বৃষ্টি

ইয়াছিন ইবনে ফিরোজ

আকাশের কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে সূর্যের আলো, আর তাতেই পৃথিবী জুড়ে নেমে এসেছে এক স্নিগ্ধ বিষণ্ন রূপ। গ্রামের নাম নিশিচিন্দিপুর। এই গ্রামের বারো বছরের কিশোর আরিফ আর তার ছোট বোন আসমা। বর্ষাকাল এলেই যেন এই ভাইবোনের আনন্দের সীমা থাকে না, যদিও তাদের ভাঙা চালের খড়ের ঘরটা দিয়ে টুপটুপ করে জল পড়ে। আজ সকাল থেকেই একটানা ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। দুপুরের দিকে সেই বৃষ্টি রূপ নিল তুমুল মুষলধারে। মেঘের ডাকে আকাশ কেঁপে উঠছে। আরিফের মা ফাতেমা বিবি রান্নাঘরে খড়কুটো দিয়ে কোনোমতে দুপুরের একটু পাতলা খিচুড়ি ফুটিয়ে নামিয়েছেন। এই বৃষ্টিতে তরকারি ছাড়াই সামান্য নুন আর লংকা দিয়ে বাচ্চাদের মুখে দিতে হবে এই খাবার। তিনি আরিফকে বকলেন, 'এই বাদলার দিনে বাইরে পা বাড়াবি না বলছি আরিফ, জ্বর কিংবা সর্দি হলে ওষুধ কেনার টাকা নেই। আল্লাহ না করুক, অসুখ-বিসুখ হলে ডাক্তার দেখানোর সাধ্য আমাদের নেই।'

কিন্তু কিশোর মনকে কি আর ঘরের কোণে বন্দি করে রাখা যায়? বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা একটু কমতেই আসমা আরিফের হাত টেনে ধরল। চোখে তার চঞ্চল ইশারা। মায়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে দুজনে একছুটে বেরিয়ে পড়ল বাড়ির পেছনের বাঁশবাগানের দিকে। বর্ষার জলে ধুয়ে চারদিকের গাছপালা সব গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেছে। মাটির একটা সোঁদা গন্ধ বাতাসে ভাসছে।

বাঁশবাগান পেরিয়ে তারা যখন নদীর ধারে গেল, তখন চারদিকে নীরবতা ও কালো মেঘে ঢাকা। হঠাৎ আবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। কিন্তু এবার তারা আর পালাল না। আরিফ দুহাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ছুঁতে চাইল। 'আসমা, দেখ কেমন বড় বড় ফোঁটা পড়ছে!' আরিফের গলার স্বরে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ। আসমা ততক্ষণে মাথায় ওড়নাটা ভালো করে জড়িয়ে বৃষ্টির জল মাখছে। সে একছুটে গিয়ে একটা বড় কচুপাতা কেটে নিয়ে এলো। সেটাকে ছাতার মতো আরিফের মাথায় ধরে বলল, নে, ভিজিসনে, আম্মা বকবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই কচুপাতা খসে পড়ল, আর দুই ভাইবোন মিলে বৃষ্টির মধ্যেই শুরু করল কানামাছি খেলা। তাদের এই চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও কিশোর মনের অনাবিল আনন্দকে কোনো অভাব ছুঁতে পারল না। দেশের সামগ্রিক অবস্থা ও গরিবের হাহাকার কিন্তু এই আনন্দের আড়ালে লুকিয়ে ছিল এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা। একটানা কয়েক দিনের বর্ষায় পুরো দেশের নিম্নবিত্ত মানুষের অবস্থা শোচনীয়। নদীভাঙনে হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়েছে। কৃষকের ধান পানির নিচে তলিয়ে গেছে। দিনমজুর, রিকশাচালক আর খেটে খাওয়া মানুষেরা ঘরের কোণে বন্দি। কাজ নেই, তাই ঘরে খাবারও নেই। চারদিকে শুধু অভাব আর ক্ষুধার হাহাকার। বৃষ্টির জল যত বাড়ছে, গরিবের চোখের জলও ততটাই যেন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। নদীর ওপারে চরের দিকে তাকালে দেখা যায়, একের পর এক কাঁচা ঘর জলের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে। মানুষ তাদের গবাদি পশু আর যৎসামান্য আসবাবপত্র নিয়ে একটু উঁচু আশ্রয়ের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে। কিন্তু তাদের এই হাহাকার শোনার মতো যেন কেউ নেই।

গ্রাম থেকে একটু দূরে শহর, সেখানে ধনি ও উচ্চবিত্তদের বসবাস। সেখানে থাকেন শহরের বড় ব্যবসায়ী আলহাজ করিম চৌধুরীও। জাকাত বা গরিবের হকের টাকা তারা প্রতিবছর নামমাত্র দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করেন। এই দুর্যোগের দিনে যেখানে গ্রামের মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল, সেখানে চৌধুরীবাড়ির সদর দরজা গরিবদের জন্য বন্ধ। তারা ঘরের ভেতরে বসে দামি এসি চালিয়ে, দামি পোলাও-কোর্মা খেয়ে আয়েশ করছেন। গরিবের এই হাহাকার তাদের বিলাসিতায় কোনো আঁচড় কাটতে পারেনি। ইসলামের মূল শিক্ষা, মানবিকতা মুমিনের অন্যতম গুণ। মুমিন তার প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে নিজে পেট পুরে খেতে পারে না। কারণ এটা আমাদের প্রিয় নবির শিক্ষা নয়। কোরআনের শিক্ষা নয়।

টানা বৃষ্টিতে পাহাড়ি ঢল আর বাঁধভাঙা জল নিমেষেই গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে দিতে লাগল। চৌধুরী সাহেব ভেবেছিলেন তার উঁচু পাকা দালানের কিছুই হবে না। কিন্তু জল যখন উপচে পড়তে লাগল, তখন পুরো এলাকা একাকার হয়ে গেল। নিচু এলাকার পচা আবর্জনা, ড্রেনের নোংরা জল আর মহামারি ছড়ানো জীবাণু ধেয়ে এলো চৌধুরীবাড়ির দিকেও। হঠাৎ করেই এক রাতে বন্যা ও দূষিত জলের কারণে চৌধুরী সাহেবের একমাত্র আদরের নাতি রাওফা ডায়রিয়া এবং তীব্র টাইফয়েডে আক্রান্ত হলো। গ্রামের সমস্ত রাস্তাঘাট তখন জলের নিচে তলিয়ে গেছে, কোনো গাড়ি চলার উপায় নেই। যে বিপুল অর্থ-সম্পদের গরিমায় তারা গরিবের দিকে ফিরেও তাকাননি, সেই টাকা দিয়েও এই দুর্যোগের রাতে ডাক্তার আনা সম্ভব হলো না। যে বাঁধ তারা অবহেলা করে মেরামতের উদ্যোগ নেননি, সেই বাঁধভাঙা জল আজ তাদেরও বন্দি করে ফেলেছে।

সন্ধ্যা নেমে আসার আগে যখন আরিফ আর আসমা বাড়ি ফিরল, তখন দুজনেই একেবারে ভিজা বিড়াল। মা ফাতেমা বিবি প্রথমে রাগ করলেও, ওদের ওই নিষ্পাপ মুখ দুটো দেখে আর বকতে পারলেন না। শুকনো কাপড় দিয়ে দুজনের মাথা মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'বাঁদর দুটো যেন কোথা থেকে এসেছে! হাত-মুখ ধুয়ে আয়, মাগরিবের আজান দিচ্ছে। নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া কর, আল্লাহ যেন এই আজাব থেকে এ দেশের গরিব মানুষকে রক্ষা করেন।' সেদিন রাতে ভাঙা ঘরের জানলা দিয়ে আসা ঠান্ডা হাওয়া আর টিনের চালে বৃষ্টির রিমঝিম শব্দের মাঝে শুয়ে শুয়ে আরিফ শুনতে পেল দূর থেকে ভেসে আসা বন্যার জলের গর্জন। সে মনে মনে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করল, যেন কাল সকালের সূর্যটা দেশের সব মানুষের মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তোলে, উচ্চবিত্তদের মনে যেন গরিবের প্রতি দয়া জাগে, আর বর্ষা যেন কেবলই আনন্দের বার্তা নিয়ে আসে, কান্নার নয়।

পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে
বাংলাদেশ বেতারের বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ

২৬ জুন ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ ● ১২ আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ● ১০ মহররম ১৪৪৮ হিজরী

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা

নিশুতি অধিবেশন

ঢাকা-খ : (এফ এম ৯০ মেগাহার্জ)

রাত

১২-১৫ কারবালার কান্না: নাটক
রচনা: আব্দুল হাই দুর্বার
প্রযোজনা: এস এম সরোয়ার হোসেন (পুনঃপ্রচার)

২-০০ কাঁদে ফোরাত নদী:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিনকশা
গীতরচনা, গ্রন্থনা, সুর সংযোজন ও
সংগীত পরিচালনা: আবু বকর সিদ্দিক
প্রযোজনা: মোঃ হাসনাতুল আজম (পুনঃপ্রচার)

ঢাকা-ক : মধ্যম তরঙ্গ ৬৯৩ কিলোহার্জ (এফ এম ৯০, ১০২ ও ১০৬ মেগাহার্জ)

সকাল

৮-৩০ দর্পণ: জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও
সংস্কৃতিবিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
গ্রন্থনা: খন্দকার নাফিস ইফতেখার
উপস্থাপনা: মোঃ মঈনুল ইসলাম ও ফারহানা খান পূরবী
প্রযোজনা: ড. সায়লা আকতার

৯-০৫ কাঁদে ফোরাত:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
গ্রন্থনা: মোসাঃ তানজিলা শামসুন নাহার
উপস্থাপনা: মোঃ জাফির হাসান ও আনিশা আমিন
প্রযোজনা: ইশরাত শারমিন

১০-০৫ বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
আলোচ্য বিষয়: পবিত্র আশুরার ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও
তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা
আলোচনা: মাওলানা মোঃ ছিফাত উল্লাহ,
মাওলানা সাইয়্যেদ মুহিবুল্লাহ
সঞ্চালনা: মাওলানা মোঃ হাফিজুর রহমান
প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

১০-৩০ কাঁদায় আজও মহররম: বিশেষ গীতিনকশা
গবেষণা, গ্রন্থনা ও গীত রচনা: সৈয়দ শফিউল আজম
সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা: বাবু সরকার
প্রযোজনা: মো: মনিরুজ্জামান

বেলা

৩-০৫ ফোরাত নদীর তীরে: নাটক
রচনা: কাজী আসাদ
প্রযোজনা: মীর নাসির আহমেদ নিউটন

বিকেল

৪-৩৫ আলোকিত জীবন: ইসলাম ধর্ম বিষয়ক অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মাওলানা কাজী মারুফ বিল্লাহ
প্রযোজনা: প্রযোজনা: মাহফুজুল ইসলাম

রাত

৯-০৫ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন (শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে সাজানো ম্যাগাজিন)
প্রাসঙ্গিক কথা: গ্রন্থনাকারী
শিল্পী: দিলশাদ জাহান
গ্রন্থনা: মোঃ মনিরুজ্জামান পলাশ
উপস্থাপনা: মোঃ আমিনুল ইসলাম ও জিনাত আক্তার
প্রযোজনা: মোঃ হাসনাতুল আজম

১০-০০ জিয়ন কাঠি: নাটক
রচনা: শেখ মোস্তাফিসুর রহমান
প্রযোজনা: এ বি এম মাহবুবুর রহমান

বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম

প্রথম অধিবেশন

৮-১৫ আলোকপাত: প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নাজনীন আকতার রেখা
সাক্ষাৎকার: পবিত্র আশুরার তাৎপর্য ও শিক্ষা
প্রদান: ড. আ. ক. ম আবদুল কাদের
গ্রহণ: মোঃ মমিনুল হক
প্রযোজনা: অয়ন চক্রবর্তী

৯-২০ কারবালার শিক্ষা:
শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা, গবেষণা ও পরিচালনা: আয়েশা খাতুন
শিশু উপস্থাপক: সাদিকা সাদিয়া ও আজমেরী জাহান আরিশা
পবিত্র আশুরার শিক্ষা নিয়ে শিশুতোষ আলোচনা: পরিচালক
প্রযোজনা: রাকিবা কবির

২য় অধিবেশন

১-৩০ কারবালার শোকগাঁথা: গ্রন্থনাবদ্ধ গানের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আবছার উদ্দিন অলি
উপস্থাপনা: উম্মে কুলসুম
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৩-৩০ মহররমের মহিমা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: শাহীন আক্তার
সুর সংযোজন ও সংগীত পরিচালনা: পাপিয়া আহমেদ
ধারাবর্ণনা: মেহেবুবা-ই-ফাতেমা ও এহতেশামুল হক
প্রযোজনা: শুভাশীষ বড়ুয়া

৫-১০ ফোরাতের শোকগাঁথা: স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: ফারহানা সাদেক
প্রযোজনা: মো. ইফতেখার হোসেন

১০-০০ পবিত্র আশুরার বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
পরিচালনা: মাওলানা মোহাম্মদ নোমান
প্রযোজনা: ড. মোঃ সাঈদুর রহমান

বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী

সকাল

৯-০৫ মহরমের মাতম: শিশু-কিশোরদের জন্যে বিশেষ অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: রওশন আরা বেগম কেয়া
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

বেলা

৩-০৫ কারবালার আর্তনাদ: বিশেষ নাটক
মূল রচনা: মীর মোশাররফ হোসেনের
বিষাদ সিন্ধু অবলম্বনে রচিত
বেতার নাট্যরূপ ও প্রযোজনা: মোঃ আমজাদ আলী

বিকেল

৪-১০ শোকাতুর কারবালা: গীতিনক্শা
রচনা: বাসেত হোসেন প্রামাণিক
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনায়: আব্দুস সালাম
ধারাবর্ণনা: শিখা খাতুন
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৫-১০ পবিত্র আশুরার তাৎপর্য ও শিক্ষা: আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: ড. মোঃ কাওসার হোসাইন
অংশগ্রহণ: ড. ইফতেখারুল আলম মাসউদ ও মাওলানা মো. জহুরুল ইসলাম
প্রযোজনা: এস এম নাদিম সুলতান

বাংলাদেশ বেতার রংপুর

৯-০৫ এলো মহররমের চাঁদ: শিশু-কিশোরদের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা (পবিত্র আশুরা নিয়ে): পারভীন সুলতানা
উপস্থাপনা: মো: তাহীর আবরার তাহী
প্রযোজনা: মোছা: ফারহানা আর্জুমান বানু

২-১০ কারবালায় শোকের মাতম: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: অধ্যাপক মো: শাহ আলম
উপস্থাপনা: মো. হামিম ও শাহরিয়া সিদ্দিকী
সুর ও সঙ্গীত: মো: আহসান হাবিব
প্রযোজনা: সৌমেন বাছাড়

৩-০৫ পবিত্র আশুরা এর তাৎপর্য বিষয়ক আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
পরিচালনা: মাওলানা মো: আলী সরকার
প্রযোজনা: মোছা: ফারহানা আর্জুমান বানু

৩-৩০ বাংলা কাওয়ালি (বাদ্যযন্ত্রবিহীন):
শাকিল কাওয়াল ও তার দল

৫-৩০ ফোরাতের কূলে: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আবু জাফর সাবু, ধারাবর্ণনা: লুৎফুল কবীর পান্না
সুর ও সংগীত: মো: আব্দুর রশিদ
প্রযোজনা: মো: আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশ বেতার সিলেট

প্রথম অধিবেশন

৭-৩০ কাঁদে কারবালা: হামদ, নাত ও মর্শিয়া সংবলিত গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সাজন আহমদ সাজু
উপস্থাপনা: সায়মা সুলতানা
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

৯-২০ আশুরার শিক্ষা: শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
প্রসঙ্গ কথা: পবিত্র আশুরা: উপস্থাপক
ইমাম হুসাইনের শাহাদতের স্মৃতি নিয়ে শিশুতোষ আলোচনা: মো: আব্দুল আউয়াল
শহীদ-ই-কারবালা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আব্দুস সবুর মাখন
সুরসংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: মো: স্বপন খান
গ্রন্থনা: রোমানা সুলতানা
উপস্থাপনা: লুবাবা মুহতাসীন চৌধুরী
প্রযোজনা: ইফতেকার আলম রাজন

২-০৫ কারবালার ধ্বনি:
হামদ, নাত ও মর্শিয়া সংবলিত গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শামীমা আক্তার
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

২-৩০ শোকের মাতম: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আনোয়ার হোসেন রনি
সুর সংযোজনা: মোঃ কুতুব উদ্দিন
ধারাবর্ণনা: জান্নাতুল নাজনীন আশা
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

৫-১০ ত্যাগের তাজিয়া:
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠান
পরিচালনা: মাওলানা ক্বারী মতিউর রহমান
প্রযোজনা: মো: ইকবাল হোসাইন

৮-১০ ইসলামের ইতিহাসে ঘটনাবহুল দিন পবিত্র আশুরা:
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: সৈয়দ শাহ মো: এমরান,
অধ্যাপক জেবা আমাতুল হান্না,
মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম
সঞ্চালনা: এ টি এম আবু তালেব মুরাদ
প্রযোজনা: ফাতেমাতুজ জোহরা

১০-০০ ত্যাগ চাই, মর্সিয়া-ক্রন্দন চাহি না:
হামদ, নাত ও মর্শিয়া সংবলিত গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আব্দুস সবুর মাখন
উপস্থাপনা: কুমকুম হাজেরা মারুফা
প্রযোজনা: মো: দেলওয়ার হোসেন

বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও

প্রথম অধিবেশন
মধ্যম তরঙ্গ ৩০০.৩০ মিটার ব্যান্ড ৯৯৯ কিলোহার্জ এবং এফএম ৯২.০ মেগাহার্জ

১০-৩০ কারবালার কান্না: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মো: আনোয়ারুল ইসলাম, ধারাবর্ণনা: তানিয়া আক্তার ও হাসান রায়হান
সুর ও সংগীত পরিচালনা: কায়ছার আলী রুবেল
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

৪-৩০ পবিত্র আশুরার ঐতিহাসিক ঘটনা ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিল
পরিচালনা: মাওলানা মো: ফজলে রাব্বি মুর্তজাবী
অংশগ্রহণ: মাওলানা মো: ওসমান গণি, মাওলানা মো: মকিম, মাওলানা মো: মাহবুব আলম
প্রযোজনা: মো: নুরুল আবছার

৫-১০ রক্তাক্ত কারবালা: পবিত্র আশুরার উপলক্ষ্যে বিশেষ নাটক
রচনা ও প্রযোজনা: মাশরেকুল আরেফিন

বাংলাদেশ বেতার বরিশাল

প্রথম অধিবেশন

৮-১৫ পুথিপাঠ: রেনু পারভীন বয়াতি ও সঙ্গীরা

১০-০৫ ফোরাতের তীরে: গীতিনকশা
রচনা: এ এম নাসির উদ্দিন,
সুর ও সংগীত পরিচালনা: সহিদুজ্জামান মামুন
বর্ণনা: ফেরদৌসি খান, প্রযোজনা: সৈকত চন্দ্র হালদার

২য় অধিবেশন

২-৪৫ ক্রন্দসি কারবালা: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মুহাঃ গোলাম মোস্তফা
অংশগ্রহণ: ফারজানা ইসলাম, জিয়াউর রহমান
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৩-০৫ অশ্রুসজল কারবালা: অংশগ্রহণ গীতিনকশা
রচনা: শেখ কামরুন নাহার কাদির
ধারাবর্ণনা: আনিকা আলম লিনাত
সুর ও সংগীত পরিচালনা: কাজী মামুন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৩-৩০ আশুরার ঐতিহাসিক শিক্ষা ও তাৎপর্য: আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনা: অধ্যাপক আবু জাফর মোঃ হাবিবুর রহমান,
অংশগ্রহণ: মাও মো: আব্দুল হাকিম মাদানী,
ড. মুহা: গোলাম ছরোয়ার, প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি

প্রথম অধিবেশন

৮-১০ কাঁদে কারবালা: বিশেষ গীতি নকশা
রচনা: মনির আহমেদ
ধারাবর্ননা: মোঃ হাছান উদ্দিন ও রুখসানা আক্তার
প্রযোজনা: মোঃ জাকারিয়া সিদ্দিকী

৮-৪০ কারবালার পঙ্‌ক্তিমালা: স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মো: মহিউদ্দিন
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

দ্বিতীয় অধিবেশন

২-০৫ সত্য করেনি মাথা নত: যুব সমাজের জন্য অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: নুরে নাজিবা নুহা
দিবসভিত্তিক প্রসঙ্গ কথা: উপস্থাপক
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

২-৩৫ কারবালার প্রান্তরে:
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
রচনা ও গ্রন্থনা: হাসান মাহমুদ মনজু
উপস্থাপনা: তাসনিম সালেহ
দিবস ভিত্তিক প্রসঙ্গ কথা-উপস্থাপক
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

৩-৩৫ বিষাদময় কারবালা: বিশেষ উপলক্ষ্যে মহিলাদের অনুষ্ঠান
গবেষণা, গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: শিরিন আক্তার
দিবস ভিত্তিক প্রসঙ্গ কথা: উপস্থাপক
সত্য ও ন্যায়ের পথ কারবালা: বিষয়ে সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদান: শামীম আরা বেগম, শিরিন পারভীন
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: শিরিন আক্তার
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

৫-২০ বেতার বিবরণী: রাঙ্গামাটি অঞ্চলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে বেতার বিবরণী ধারণ
ধারণে: মো: তারেক আহমেদ

৭-০৫ আশুরার গুরুত্ব ও তাৎপর্য:
কারবালা প্রান্তরে সকল শহিদের মাগফেরাত কামনা করে আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিল
সঞ্চালনা: মাও মোঃ নুরুল আলম সিদ্দিকী
অংশগ্রহন: ইকবাল বাহার চৌধুরী, নুরুল আমিন,
আনোয়ারুল হক
প্রযোজনা: মো: জাকারিয়া সিদ্দিকী

বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার

দ্বিতীয় অধিবেশন

১-৩০ আশুরার এই দিনে:
শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সোহানা মুনতাহা
দিবস ভিত্তিক আলোচনা: উপস্থাপক
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

২-০৫ বিশেষ দোয়া মাহফিল
পরিচালনা: মাওলানা মোঃ হেলাল উদ্দিন
অংশগ্রহণ: মাওলানা মো: ইউনুজ ফরাজী,
মাওলানা মোঃ কামাল উদ্দিন, আব্দুল মান্নান
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

২-৩৫ ঝরে নয়ন জল: কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনায়: সিরাজুল হক সিরাজ
অংশগ্রহণ: রোমেনা আকতার, ইসপিতা আবরার সোহা,
কে এম সানাউল হক
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

৩-৩৫ নদী লাল আজ মানুষের খুনে (রক্ত): বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মোহাম্মদ আলী পাশা, সংগীত পরিচালনা: সৈয়দুল হক
প্রযোজনা: আহমদ মুনতাসির মুয়ীয চৌধুরী

বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৯-১৫ কারবালার প্রান্তরে: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: হোসনে আরা খানম
প্রযোজনা: আহাদ মোঃ সাঈদ হায়দার

২য় অধিবেশন

২-৩৫ বিশেষ কথিকা: মোঃ শাহাবুদ্দিন

৩-১০ কারবালা শোকের মাতম: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: সৈয়দুল হক
ধারাবর্ণনা: দিলরুবা আক্তার উর্মি ও মোবারক হোসেন
প্রযোজনা: আহাদ মোঃ সাঈদ হায়দার

৪-১০ কারবালার শোক ও চেতনা: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণ: মোঃ ওসমান গণি, মোঃ ইসমাইল খান
সঞ্চালনা: মোঃ মোবাশ্বেরুল হক
প্রযোজনা: আহাদ মোঃ সাঈদ হায়দার

বাংলাদেশ বেতার কুমিল্লা

সকাল

৯-০৫ পুথি পাঠ: আবদুল কাইয়ুম

৯-৩৫ ইসলামে আশুরার গুরুত্ব ও তাৎপর্য: বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
আলোচক: প্রফেসর ড. মোকাদ্দেস-উল-ইসলাম বিদ্যুৎ,
মাওলানা মোশাররফ হোসাইন
সঞ্চালনা: নুর মোহাম্মদ রাজু,
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

বিকাল

৩-৪০ আশুরার তাৎপর্য ও শিক্ষা: বিশেষ আলোচনা
ও দোয়া মাহফিল
পরিচালনা: মাওলানা হাবিবুর রহমান আল-ফরিদী
অংশগ্রহণ: মাওলানা ইব্রাহীম মাহমুদী ও
মাওলানা শাহজালাল সিরাজী
প্রযোজনা: কাজী মো. নুরুল করিম

৪-৩০ কারবালার কাব্যগাথা: কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সাজিয়া ইয়াসমিন
প্রযোজনা: এ এইচ এম মেহেদি হাছান

৬-০৫ আশুরার চেতনায় শিশু-কিশোর
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপন: নাজমুন নাহার পূর্ণি
প্রযোজনা: কাজী মোঃ নুরুল করিম

৬-২৫ ত্যাগের অমিয় বাণী: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আবু তাহের মজুমদার
সুর ও সংগীত পরিচালনা: এম এ কাইউম খান
প্রযোজনা: এ.এইচ.এম. মেহেদি হাছান

বাংলাদেশ বেতার গোপালগঞ্জ

এফএম ৯২.০ মেগাহার্জ
প্রথম অধিবেশন

সকাল

৯-০৫ আশুরার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, শিক্ষা ও তাৎপর্য:
বিশেষ আলোচনা ও দোয়া মাহফিল
সঞ্চালনা: ড. আবু সাঈদ মো: আবদুল্লাহ
অংশগ্রহণ: আবু অবায়দা মোহাম্মদ মাস-উ-দুল হক,
মোঃ আবুল কালাম আজাদ,
হাফেজ মাওলানা মুফতি ওয়ালিউল্লাহ
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১০-০৫ ফোরাতের তৃষ্ণা: মর্শিয়া, হামদ ও নাত-ই-রসুল (স.)-এর
সমন্বয়ে বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থণা ও উপস্থাপনা: রুকাইয়া ইসলাম
প্রযোজনা: মইনুল ইসলাম

দ্বিতীয় অধিবেশন

দুপুর

২-০৫ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে পুথিপাঠ
পাঠ: আবু বকর সিদ্দিক

২-২০ এলো আবার সেই শোকের দিন:
মর্শিয়া নিয়ে বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সিফাত বিনতে জামান রাকা
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বিকাল

৪-০৫ আশুরার এই দিনে: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: খন্দকার আব্দুল মোতালেব
সুর ও সংগীত পরিচালনা: স ম খায়রুল ইসলাম
ধারাবর্ণনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা: নীলিমা মৌসুমি

৫-১০ শোকগাথা কারবালা: বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: এস এম নাসির উদ্দিন
সুর ও সংগীত পরিচালনা: সজীব আহমেদ
ধারাবর্ণনা: ইমন
প্রযোজনা: হাসনাইন ইমতিয়াজ

৫-৪০ কারবালার কান্না: কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা: রবিউল ওহাব
প্রযোজনা: ফয়সাল মাহমুদ

সন্ধ্যা

৬-২০ বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থণা ও ধারাবর্ণনায়: মোজাম্মেল হোসেন মুন্না
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৮-৪৫ পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে হামদ্-নাত পরিবেশন

৯-৪০ তপ্ত মরুর হাওয়া: বিশেষ অনুষ্ঠান

১০-২০ কান্দে আকাশ কান্দে বাতাস: একটি বিশেষ অনুষ্ঠান

১০-৪৫ হামদ্-নাত পরিবেশন

২য় অধিবেশন

দুপুর

২-৩৫ হামদ্-নাত পরিবেশন

বিকাল

৩-৩০ হামদ্-নাত

৪-২০ হামদ্-নাত পরিবেশন

৪-৪০ ১০ মহররম

৫-১০ হামদ্-নাত পরিবেশন

জনসংখ্যা স্বাস্থ্য পুষ্টি সেল

সকাল

৭.২০ সুখের ঠিকানা
ক। পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে উপস্থাপক কর্তৃক আলোকপাত।
খ। প্রশ্নোত্তরে আলোচনা: গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করণে করনীয়।
সাক্ষাৎকার প্রদানে: পুষ্টিবিদ ছাঈদা লিয়াকত, জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল।
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: আজহারুল ইসলাম।
সম্পাদনা: মো: আকবর হোসেন।
তত্ত্বাবধানে: সৈয়দা তাসলিমা আক্তার।
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী।

বহির্বিশ্ব সার্ভিস দপ্তর

বাংলা সার্ভিস

ক. পবিত্র আশুরার প্রেক্ষাপট বিষয়ে ভূমিকা
খ. বিশেষ আলোচনা
বিষয়: পবিত্র আশুরার তাৎপর্য
লেখক: আব্দুস সালাম খান
গবেষণা, সংকলনা ও উপস্থাপনা: লায়লা আরিয়ানী হোসাইন
সার্বিক নির্দেশনা: মোহাম্মদ জলিলুল হক
প্রযোজনা: প্রশান্ত কুমার মন্ডল

English Service

Intro on the background of Holy Ashura
Special Talk: Topic: Significance of the Holy Day of Ashura
Written by : Abdus Salam Khan (DG, Islamic Foundation)
Research and Compilation and Presented by:
Laila Ariyani Hossain
Directed by: Nibedita Ahmed Tuli
Supervised by: Mst. Jesmin Nahar
Produced by: Proshanta Kumar Mandal

কৃষি সার্ভিস দপ্তর

সকাল

৬-৫০ কৃষি সমাচার: কৃষি ও পরিবেশভিত্তিক অনুষ্ঠান
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক আলোচনা: উপস্থাপক
মার্সিয়া: অসিম ব্যথায় আকুল হয়ে
শিল্পী: খালিদ হোসেন, কথা: আজিজুর রহমান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: জোবায়েদ হোসেন পলাশ
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

সন্ধে

৬-০৫ সোনালি ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
গ্রামীণ মা-বোনদের জন্য অনুষ্ঠান কৃষাণি
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
বিষাদ সিন্ধু থেকে পাঠ: জান্নাতুল ফেরদৌস তমা
মার্সিয়া: এলো ফিরে এলো ফিরে
শিল্পী: আব্দুল হালিম চৌধুরী, কথা: সৈয়দ শামসুল হুদা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: তানিয়া সুলতানা
প্রযোজনা: রনিয়া সুলতানা

সন্ধে

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার: জাতীয় অনুষ্ঠান
পবিত্র আশুরা উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা
পবিত্র আশুরার তাৎপর্য নিয়ে বিশেষ আলোচনা
অংশগ্রহণ: সৈয়দ ড. আব্দুল্লাহ আল মারুফ
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: মাওলানা মিজানুর রহমান
আসর পরিচালনা: লিয়াকত আলী খান
আসরে অংশগ্রহণকারী শিল্পী: শাহজাদী বেগম, বর্ষা আহমেদ, খাদিজা বেগম
প্রযোজনা: হরবিলাস রায়

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

৩টি পালায় বাদ্যযন্ত্রহীন হামদ্ নাত, মর্সিয়া এবং ইসলামি গান প্রচার করা হবে

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ

প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাংলা			
সকাল ৭-০০	২০ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ৯-০০	৫ মি.	ঢাকা	ঐ
সকাল ১০-০০	৫ মি.	ঢাকা	বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সকাল ১১-০০	৫ মি.	ঢাকা	ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
দুপুর ১২-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ২-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ৩-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, ঠাকুরগাঁও, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকাল ৪-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সন্ধ্যা ৬-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৮-৩০	২০ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ১১-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ১২-০০	৫ মি.	ঢাকা	
ইংরেজি			
সকাল ৮-০০	১০ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বেলা ১-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, রংপুর, সিলেট, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
বিকাল ৫-০০	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
রাত ৯-৩০	১০ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা
রাত ১২-০৫	৫ মি.	ঢাকা	

স্থানীয়/আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
বাংলা	সকাল ৮-১০	৫ মি.	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সকাল ৯-০৫	৫ মি.	ময়মনসিংহ
বাংলা	সকাল ৯-৩৫	৫ মি.	কক্সবাজার
বাংলা	সকাল ১০-০০	৫ মি.	খুলনা
বাংলা	সকাল ১০-০৫	৫ মি.	ময়মনসিংহ
বাংলা	সকাল ১১-০৫	৫ মি.	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	দুপুর ১২-১০	৫ মি.	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বান্দরবান
চাকমা	বেলা ১-০৫	৫ মি.	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মি.	সিলেট
বাংলা	বেলা ১-০৫	৫ মি.	রাঙ্গামাটি
মারমা	বেলা ১-১০	৫ মি.	চট্টগ্রাম
ত্রিপুরা	বেলা ১-১৫	৫ মি.	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ২-০৫	৫ মি.	রাজশাহী, রংপুর, ঠাকুরগাঁও
তঞ্চঙ্গা	বেলা ২-০৫	৫ মি.	বান্দরবান
ত্রিপুরা	বেলা ২-০৫	৫ মি.	রাঙ্গামাটি
ত্রিপুরা	বেলা ২-১০	৫ মি.	বান্দরবান
চাকমা	বেলা ২-১৫	৫ মি.	বান্দরবান
বাংলা	বেলা ২-২০	৫ মি.	চট্টগ্রাম
বাংলা	বেলা ২-৩০	৫ মি.	কক্সবাজার
মারমা	বেলা ৩-০৫	৫ মি.	বান্দরবান
বাংলা	বিকাল ৪-০৫	৫ মি.	রাজশাহী, খুলনা, বান্দরবান
চাকমা	বিকাল ৪-১৫	৫ মি.	রাঙ্গামাটি
মারমা	বিকাল ৪-২০	৫ মি.	রাঙ্গামাটি

স্থানীয়/আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা
তঞ্চঙ্গা	বিকাল ৪-২৫	৫ মি.	রাঙ্গামাটি
বাংলা	বিকাল ৪-৩০	৫ মি.	গোপালগঞ্জ
ইংরেজি	বিকাল ৪-৩০	৫ মি.	কক্সবাজার
বাংলা	বিকাল ৫-১০	৫ মি.	বরিশাল
বাংলা	বিকাল ৫-৩০	৫ মি.	কমিল্লা
ইংরেজি	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মি.	চট্টগ্রাম, খুলনা
বাংলা	সন্ধ্যা ৬-০৫	৫ মি.	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	সন্ধ্যা ৭-০০	৫ মি.	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, গোপালগঞ্জ
বাংলা	রাত ৮-০০	৫ মি.	ঠাকুরগাঁও

বিশেষ সংবাদ

প্রকৃতি	ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/রিলে
বাণিজ্যিক সংবাদ	বাংলা	বিকাল ৫-০৫	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল, গোপালগঞ্জ, ময়মনসিংহ
খেলাধুলার সংবাদ	বাংলা	রাত ৮-০৫	৫ মি.	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, কক্সবাজার, গোপালগঞ্জ, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম
সার্ক সংবাদ (সোমবার)	বাংলা	সন্ধ্যা ৬-৩৫	৭.৫ মি.	ঢাকা	
	ইংরেজি	সন্ধ্যা ৬-৪৩	৭.৫ মি.	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (মঙ্গলবার)	বাংলা	রাত ১০-০০	৫ মি.	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (বুধবার)	ইংরেজি	রাত ১০-০০	৫ মি.	ঢাকা	

সংবাদ পরিক্রমা

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার দিন	প্রচার কেন্দ্র, সম্প্রচার/রিলে
বাংলা	সকাল ১১-০৫	১০ মি.	প্রতি শুক্রবার	ঢাকা
ইংরেজি	রাত ৯-৪৫	১০ মি.	প্রতি বৃহস্পতিবার	ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা

বাংলাদেশ বেতার
বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্রের
অনুষ্ঠান শুনতে ডাউনলোড করুন
মোবাইল অ্যাপ
অ্যান্ড্রয়েড
আইওএস
বাংলাদেশ বেতারের
ফেসবুক পেজ
ভিজিট করতে স্ক্যান করুন

বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্রের সম্প্রচার সময়সূচি

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার		প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)	মন্তব্য
ঢাকা	ঢাকা-ক: ৬৯৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০	
			০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১০	৮:৫৫	
			০০:০০ - ৩:০০	৩:০০	
	ঢাকা-গ: ১১৭০ কিলোহার্জ		১৫:০০ - ১৭:০০	২:০০	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ১৯:০০	১২:০০	
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		১৪:০০ - ২৩:০০	৯:০০	
	এফএম - ১০০ মেগাহার্জ	বিবিসি	০৬:০০ - ১২:০০	৬:০০	
		বিবিসি	১৭:০০ - ২৩:০০	৬:০০	
		নিশুতি	২৩.০০ - ৩:০০	৪:০০	
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১০	৮:৫৫	
			০০:০০ - ৩:০০	৩:০০	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	এনএইচকে	২১:০০ - ২১:২০	০০:২০	
	এফএম - ১০৬ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১২:১০	৬:১০	
			১৪:১৫ - ২৩:১৫	৯:০০	
বাণিজ্যিক কার্যক্রম	এএম - ৬৩০ কিলোহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ		০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০	
ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৭:০০ - ২৩:০০	১৬:০০	
চট্টগ্রাম	এএম - ৮৭৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ১০৩ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
রাজশাহী	এএম - ৮৪৬ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ		০৬:৩০ - ১০:০০	৩:৩০	
			১৪:০০ - ১৪:৩০	০০:৩০	
			১৬:০০ - ২৩:১২	৭:১২	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
খুলনা	এএম - ৫৫৮ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার	প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)	মন্তব্য
খুলনা	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১৪:০৫	৮:০৫	যান্ত্রিক সমস্যার কারণে সম্প্রচার বন্ধ আছে
		১৪:০৫ - ১৪:৩০	০০:২৫	
		১৯:০০ - ২৩:১৫	৪:১৫	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১৯:৩০ -২৩:১৫	৩:৪৫	
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১৪:৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫	
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১৪:৩০ - ২৩:১৫	৮:৪৫	
রংপুর	এএম - ১০৫৩ কিলোহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১৯:৩০ - ২৩:০০	৩:৩০	
	এফএম - ১০৫.৬ মেগাহার্জ	১৪:০৫ - ১৪:৩০	০০:২৫	
		১৮:২০ - ২৩:০০	৪:৪০	
সিলেট	এএম - ৯৬৩ কিলোহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১২:০০ - ২৩:১৫	১১:১৫	
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	০৭:০০ - ১০:০০	৩:০০	
		১৯:০০ - ২৩:০০	৪:০০	
	এফএম - ১০৫.২ মেগাহার্জ এনএইচকে	২১:০০ - ২১:২০	০০:২০	
বরিশাল	এএম - ১২৮৭ কিলোহার্জ	০৬:০০ - ১১:১০	৫:১০	
		১৪:৫৫ - ১৫:৫৫	৮:২০	
		১৫:৫৫ - ২৩:১৫	৮:২০	
	এফএম - ১০৫.২ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১১:১০	৫:১০	
		১৩:৫৫ - ২৩:১৫	৯:২০	
ঠাকুরগাঁও	এএম - ৯৯৯ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১১:১৫	৪:৪৫	
		১৪:০০ - ২৩:১৫	৯:১৫	
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১১:১৫	৪:৪৫	
		১৪:০০ - ২৩:১৫	৯:১৫	
রাঙ্গামাটি	এএম - ১১৬১ কিলোহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১৪:৫৫ - ২১:০০	৬:০৫	
	এফএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
		১৩:৫৫ - ২১:০০	৭:০৫	
কক্সবাজার	এএম - ১৩১৪ কিলোহার্জ	০৬:০০ - ২১:০০	১৫:০০	
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ২১:০০	১৫:০০	

কেন্দ্র/ইউনিট	ট্রান্সমিটার		প্রচার সময়	স্থিতি (ঘণ্টা)	মন্তব্য
কুমিল্লা	এএম - ১৪১৩ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৪:৫৫ - ২৩:১৫	৮:২০	
	এফএম - ১০১.২ মেগাহার্জ		২১:০০ - ২১:৩০	০০:৩০	
	এফএম - ১০৩.৬ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৩:৫৫ - ২৩:১৫	৯:২০	
বান্দরবান	এএম - ১৪৩১ কিলোহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৪:৫৫ - ২১:০০	৬:০৫	
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৬:০০ - ১০:০০	৪:০০	
			১৩:৫৫ - ২১:০০	৭:০৫	
গোপালগঞ্জ	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৮:০০ - ১১:০০	৩:০০	
			১৪:০০ - ২১:০০	৭:০০	
ময়মনসিংহ	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ		০৮:০০ - ১:০০	৫:০০	
			১৪:০০ - ২১:০০	৭:০০	
বহির্বিশ্ব কার্যক্রম (শর্টওয়েভ)	ফ্রিকোয়েন্সি ৪৭৫০ কিলোহার্জ	ইংরেজি	১৮:৩০ - ১৯:০০	০০:৩০	
		নেপালি	১৯:১৫ - ১৯:৪৫	০০:৩০	
		হিন্দি	২১:১৫ - ২১:৪৫	০০:৩০	
		আরবি	২২:০০ - ২২:৩০	০০:৩০	
		বাংলা	২২:৩০ - ২৩:৩০	১:০০	
		ইংরেজি	২৩:৪৫ - ০১:০০	১:১৫	
		বাংলা	০১:১৫ - ০২:০০	০০:৪৫	

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ

(সময়কাল: ২৬/০৩/২০২৬ - ২৫/০৫/২০২৬)

১. বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র হতে একযোগে সরাসরি (লাইভ)। সংবাদ প্রবাহ অনুষ্ঠানে প্রচারিত ভাষণসমূহ:

মহামান্য রাষ্ট্রপতি

প্রচারের তারিখ	স্থান	প্রদত্ত ভাষণের বিষয়বস্তু
২৬/০৩/২০২৬	জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের কার্যক্রম
২৬/০৩/২০২৬	জাতীয় প্যারেড স্কয়ার	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজিত সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের কার্যক্রম
০১/০৫/২০২৬	বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র	মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস/২০২৬ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

প্রচারের তারিখ	স্থান	প্রদত্ত ভাষণের বিষয়বস্তু
২৬/০৩/২০২৬	জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ অনুষ্ঠানের কার্যক্রম
২৬/০৩/২০২৬	জাতীয় প্যারেড স্কয়ার	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে আয়োজিত সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের কার্যক্রম
২৭/০৩/২০২৬	ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনাসভা
৩০/০৩/২০২৬	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	জাতীয় পর্যায়ের ক্রীড়াবিদদের ক্রীড়া কার্ড বিতরণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান
১৪/০৪/২০২৬	টাঙ্গাইল	শহিদ মারুফ স্টেডিয়ামে আয়োজিত কৃষক কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠান
১৬/০৪/২০২৬	ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন	স্বাধীনতা পদক/২০২৬ পদক বিতরণ অনুষ্ঠান
১৭/০৪/২০২৬	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা	হজ্ব যাত্রীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং হজ্ব ফ্লাইট/২০২৬-এর শুভ উদ্বোধন
১৮/০৪/২০২৬	ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের সম্মেলন/২০২৬ অনুষ্ঠান
২০/০৪/২০২৬	বগুড়া	জেলা দায়রা জজ আদালতে বগুড়া জেলা আইনজীবী সমিতির নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন; শহিদ জিয়া ডিগ্রি কলেজ মাঠে আয়োজিত ফ্যামিলি কার্ড প্রদান; বগুড়া পৌর ভবনে নবসৃষ্ট বগুড়া সিটি কর্পোরেশনের ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচন; গাবতলী উপজেলার বাগবাড়ীতে হাম-রুবেলার টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন; বাগবাড়ী গ্রামের চৌকিরদহে খাল খনন কাজের উদ্বোধন ফলক উন্মোচন এবং বগুড়ার ঐতিহাসিক আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে বিএনপি আয়োজিত জনসভায় ভাষণ
১৮/০৪/২০২৬	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সরকারের ২ মাস পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠানের কার্যক্রম
২৫/০৪/২০২৬	বিয়াম ফাউন্ডেশন	বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ও বিয়াম ফাউন্ডেশন ৩য় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠান
২৭/০৪/২০২৬	যশোর	যশোরের উলমী খাল পুনঃখনন উদ্বোধন; যশোর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন এবং কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ
২৮/০৪/২০২৬	শহিদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার, ঢাকা	জাতীয় আইনগত সহয়তা দিবস/২০২৬-এর উদ্বোধন
০১/০৫/২০২৬	বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, নয়াপল্টন, ঢাকা	মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদল আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ
০২/০৫/২০২৬	সিলেট	বাঁশিয়া খাল খনন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান; জলবদ্ধতা নিরসনে সিলেট সিটি করপোরেশন গৃহীত প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও সুধী সমাবেশে ভাষণ; সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে আয়োজিত নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস-২০২৬-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

প্রচারের তারিখ	স্থান	প্রদত্ত ভাষণের বিষয়বস্তু
০৩/০৫/২০২৬	ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন	জেলা প্রশাসক সম্মেলন/২০২৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
১০/০৫/২০২৬	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ লাইনস রাজারবাগ	পুলিশ সপ্তাহ/২০২৬-এর বার্ষিক পুলিশ প্যারেড অনুষ্ঠান
১১/০৫/২০২৬	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	পুলিশ সপ্তাহ/২০২৬ উপলক্ষ্যে উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণ
১২/০৫/২০২৬	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আয়োজিত বাংলাদেশ উচ্চশিক্ষা রূপান্তর টেকসই উৎকর্ষতার রোড ম্যাপ শীর্ষক অনুষ্ঠানে ভাষণ
১৬/০৫/২০২৬	কুমিল্লা চাঁদপুর	বরুড়া, লক্ষীপুর বাজার মাঠে আয়োজিত পথসভা; ওয়ারুক বাজারে খোর্দ্দ খাল পুনঃখনন অনুষ্ঠান; ঘোষের হাটসংলগ্ন বিশ্ব খাল পুনঃখননের শুভ উদ্বোধন; চাঁদপুর সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠান;
১৯/০৫/২০২৬	তেজগাঁও, ঢাকা	১৯-২১শে মে পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী দেশ জুড়ে ভূমিসেবা মেলা/২০২৬ উদ্বোধন
২০/০৫/২০২৬	গাজীপুর	সফিপুর আনসার একাডেমিতে আয়োজিত বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৪৬তম জাতীয় সমাবেশ/২০২৬; জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও সুধী সমাবেশে ভাষণ
২৩/০৫/২০২৬	ময়মনসিংহ	বৈলর ইউনিয়নের ধরার খাল পুনঃখনন; ত্রিশালের নজরুল মঞ্চে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে যোগদান এবং তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন
২৪/০৫/২০২৬	জাতীয় সংসদ ভবন	নবায়নযোগ্য সৌর বিদ্যুৎ অন গ্রেড রুফটপ-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান

মাননীয় মন্ত্রীবর্গ

মাননীয় মন্ত্রী	তারিখ ও স্থান	প্রদত্ত ভাষণের বিষয়বস্তু
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী	২৭/০৩/২০২৬ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠান
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী	২৮/০৩/২০২৬ ঢাকা	মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী	৩০/০৩/২০২৬ জাতীয় সংসদ ভবন	জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম-এর স্ত্রী অধ্যাপক দিলারা হাফিজের নামাজের জানাজা শেষে বক্তব্য
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, আইন; বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী	৩০/০৩/২০২৬ জাতীয় সংসদ ভবন	সংসদ ভবন কেবিনেট কক্ষে জাতীয় সংসদের বিশেষ বৈঠকে বক্তব্য
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	৩১/০৩/২০২৬ জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তন	মহান স্বাধীনতার ঘোষক ও রণাঙ্গনের জিয়া শীর্ষক আলোচনাসভা
অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী	৩১/০৩/২০২৬ বাংলাদেশ সচিবালয়	২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জাতীয় রাজস্ব বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রাক-বাজেট আলোচনাসভা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী	০৩/০৪/২০২৬ ঢাকা শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট	হামজনিত নিউমোনিয়া শ্বাস কষ্টের চিকিৎসায় বাবল সিক্যাপের ব্যবহার বিষয়ক হাতে কলমে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী	০৪/০৪/২০২৬ বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি	দুই দিনব্যাপী নবীন বিজ্ঞান কংগ্রেস এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	০৬/০৪/২০২৬ ঢাকা	নারী ও শিশু অধিকারের সুরক্ষা ও অভিভুক্তমূলক নির্বাচনি ইশতেহার শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	০৬/০৪/২০২৬ জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউটের ছয়টি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠান
কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	০৮/০৪/২০২৬ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক)	"ইলিশ গবেষণা: অর্জিত সাফল্য জাটকা সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা

মাননীয় মন্ত্রীবর্গ

মাননীয় মন্ত্রী	তারিখ ও স্থান	প্রদত্ত ভাষণের বিষয়বস্তু
শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী	১০/০৪/২০২৬ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়র কারিকুলামে বহুমুখী শিক্ষার কোর্সে অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত কর্মশালা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	১১/০৪/২০২৬ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল	দি ইনস্টিটিউট অব চার্টাড অ্যাকাউন্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর ২২তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	১২/০৪/২০২৬ ঢাকা	National Multistakholder Consultation On Bangladesh Graduation Readiness Assessment শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	১৩/4/২০২৬ বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা	৩ (তিন) দিনব্যাপী ব্রডব্যান্ড এক্সপো/২০২৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী	১৪/০৪/২০২৬ ঢাকা	নতুনের আবহানে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত বাংলা নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বক্তব্য
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী	১৭/০৪/২০২৬ মাদানী এভিনিউ, ঢাকা	জুনিয়র চেম্বার ইন্টারন্যাশনাল জেসিআই কার্নিভাল/২০২৬ শীর্ষক অনুষ্ঠান
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী	১৮/০৪/২০২৬	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের সম্মেলন/২০২৬ অনুষ্ঠান
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী	২০/০৪/২০২৬ রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	হাম রুবেলা ক্যাম্পেইন/২০২৬ অনুষ্ঠান
বাণিজ্যমন্ত্রী	২০/০৪/২০২৬ অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট	হাম রুবেলা ক্যাম্পেইন/২০২৬ অনুষ্ঠান
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী	২০/০৪/২০২৬ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	জ্বালানী তেলের দাম বৃদ্ধি নিয়ে বক্তব্য
শিক্ষামন্ত্রী	২১/০৪/২০২৬ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	চলমান এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে বিফ্রিং।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	২২/০৪/২০২৬ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ (এফপিএমসি)-এর সভাপরবর্তী ব্রিফিং।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী	২৪/০৪/২০২৬ জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট	জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ/২০২৬-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	২৫/০৪/২০২৬ জাতীয় প্রেসক্লাব	ইউরোপে জনশক্তি প্রেরণ, প্রতিকূলতা ও সম্ভাবনা শীর্ষক সেমিনার
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী	২৭/০৪/২০২৬ বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	ফ্যামিলি কার্ড বিষয়ে ব্রিফিং
শিক্ষামন্ত্রী	২৭/০৪/২০২৬ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন	বিশ্ব মেধাস্বত্ব দিবস/২০২৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালা
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	২৮/০৪/২০২৬ সিরডাপ মিলনায়তন	এডাপটেশন চ্যালেঞ্জেস অফ ক্লাইমেট লিংকড মাইগ্রান্টস ইন বাংলাদেশ এন্ড লোকালী লিড সলিউশনস শীর্ষক কর্মশালা
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী	২৯/০৪/২০২৬ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক কমিটির ৪৬-তম সভা

মাননীয় মন্ত্রী	তারিখ ও স্থান	প্রদত্ত ভাষণের বিষয়বস্তু
শিল্প, বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী	২৯/০৪/২০২৬ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরামর্শক কমিটির ৪৬-তম সভা
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী	০১/০৫/২০২৬ বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র	মহান মে দিবস এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী	০১/০৫/২০২৬ বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, নয়াপল্টন	মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদল আয়োজিত শ্রমিক সমাবেশ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	০২/০৫/২০২৬ জাতীয় প্রেসক্লাব	স্বাধীন গণমাধ্যমের নতুন চ্যালেঞ্জ অপতথ্য আমাদের করণীয় শীর্ষক সেমিনার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী	০২/০৫/২০২৬ বিয়াম মিলনায়তন	Geology for Sustainable Development and Future energy Sceurity of Bangladesh শীর্ষক জাতীয় সেমিনার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	০৪/০৫/২০২৬ বাংলাদেশ বেতারের অডিটোরিয়াম	বেতার বিতর্ক প্রতিযোগিতা/২০২৬ উদ্বোধন অনুষ্ঠান
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী	০৫/০৫/২০২৬ কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল	স্বাস্থ্যসেবার সমতা প্রতিষ্ঠায় ঢাকা-১৭-এর নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন শীর্ষক অনুষ্ঠান
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	০৫/০৫/২০২৬ কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল	স্বাস্থ্যসেবার সমতা প্রতিষ্ঠায় ঢাকা-১৭-এর নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন শীর্ষক অনুষ্ঠান
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী	০৬/০৫/২০২৬ স্থানীয় একটি হোটেল	দ্য ল ক্যাম্পাস ডায়ালগ শীর্ষক বিভিন্ন দাতাসংস্থার আলোচনা
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী	০৬/০৫/২০২৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন	জেলা প্রশাসক সম্মেলন/২০২৬-এর ৪র্থ দিনের কার্যক্রম
তথ্য ও স্প্রচার মন্ত্রী	০৮/০৫/২০২৬ শিল্পকলা একাডেমি	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী	০৮/০৫/২০২৬ শিলাইদহ, কুষ্টিয়া	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী	০৮/০৫/২০২৬ পতিসর, নওগাঁ	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান
সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী	০৮/০৫/২০২৬ বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন, মালিবাগ	বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস/২০২৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী	০৯/০৫/২০২৬ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশেন মিলনায়তন	বিএনপিসহ দলটির তিন অঙ্গসংগঠনের জেলা নেতাদের সঙ্গে বিএনপি চেয়ারম্যান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মতবিনিময় সভা
শিক্ষামন্ত্রী	১০/০৫/২০২৬ ঢাকা	Study findings Dissemination Event শীর্ষক অনুষ্ঠান
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	১১/০৫/২০২৬ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময় সভা
শিক্ষামন্ত্রী	১২/০৫/২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার রূপান্তর: টেকসই উৎকর্ষতার রোডম্যাপ শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা
সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী	১৩/০৫/২০২৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন	১৯তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস/২০২৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠান

মাননীয় মন্ত্রীবর্গ

মাননীয় মন্ত্রী	তারিখ ও স্থান	প্রদত্ত ভাষণের বিষয়বস্তু
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং নৌপরিবহন মন্ত্রী	১৫/০৫/২০২৬ বাংলাদেশ সচিবালয়	স্বস্তিতে নির্বিঘ্নে আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা উদ্‌যাপনের প্রস্তুতিমূলক বৈঠক
ডাক টেলিযোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী	১৬/০৫/২০২৬ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল	টেলিকম খাতের ভবিষ্যত নতুন সরকার কি ভাবছে শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক
শিক্ষামন্ত্রী	১৭/০৫/২০২৬ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল	বাংলাদেশ চায়না গোল টেবিল Governance Experience Enchange শীর্ষক অনুষ্ঠান
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী	১৭/০৫/২০২৬ বিডা মাল্টিপারপাস হল, ঢাকা	জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পিপিপি পদ্ধতিতে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বিশেষ কর্মশালা
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী	১৮/০৫/২০২৬ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তন, ঢাকা	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ NEC সভাপরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠান
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	১৯/০৫/২০২৬ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স মাল্টিপারপাস ট্রেনিং গ্রাউন্ড, পূর্বাচল, ঢাকা	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সাপ্তাহ/২০২৬ পদক বিতরণ ও পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠান
পানিসম্পদ মন্ত্রী	১৯/০৫/২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন	নির্বচনি ইশতিহারে পানি, নদী ও কৃষি অঙ্গীকার ও তার বাস্তবায়ন শীর্ষক নাগরিক সংলাপ অনুষ্ঠানের বক্তব্য।
অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী	২০/০৫/২০২৬ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বলরুম	ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকউন্টিং অ্যান্ড রিপোর্টিং সামিট অনুষ্ঠানের বক্তব্য।
পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী	হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল	কনসারডেশন এন্ড রেস্টোরেসন ইনিশিয়েটিভ ইন দ্যা সুন্দরবনস রিজিয়ন প্রজেক্ট শীর্ষক অনুষ্ঠান
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	২২/০৫/২০২৬ মিরপুর, ঢাকা	শিশু রামিসার বাবা-মা'র সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সাক্ষাৎ পরবর্তী ব্রিফিং
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী	২২/০৫/২০২৬ শিল্পকলা একাডেমি	তিন দিনব্যাপী জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মজয়ন্তী উদ্বোধন অনুষ্ঠান
পানিসম্পদ মন্ত্রী	২৩/০৫/২০২৬ জাতীয় প্রেসক্লাব	জাতীয় নদী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাসভার বক্তব্য
সড়ক, পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রী	২৫/০৫/২০২৬ বাংলাদেশ সচিবালয়	ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী	০১/০৪/২০২৬ বাংলাদেশ সচিবালয়	আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে ব্রিফিং
শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী	০৩/০৪/২০২৬ টিএসসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	রোভার স্কাউট গ্রুপের হিরকজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান
পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী	০৭/০৪/২০২৬ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	অর্থনৈতিক শুমারি/২০২৪-এর ন্যাশনাল রিপোর্ট প্রকাশনা অনুষ্ঠান
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী	০৮/০৪/২০২৬ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বার্ক)	"ইলিশ গবেষণা: অর্জিত সাফল্য জাটকা সংরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা

মাননীয় মন্ত্রী	তারিখ ও স্থান	প্রদত্ত ভাষণের বিষয়বস্তু
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী	১৭/০৪/২০২৬ চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম ইস্টার্ন রিফাইনারি পরিদর্শন শেষে ব্রিফিং
বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী	২১/০৪/২০২৬	কো-অপারেটিভ জুট মিলস এবং বাংলাদেশ জুট মিলস পরিদর্শন শেষে বক্তব্য
শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী	২২/০৪/২০২৬ বংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র	"শিক্ষার বাজেট: বাজেটের শিক্ষা" শীর্ষক প্রাক-বাজেট আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী	০৪/৫/২০২৬ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন	জেলা প্রশাসক সম্মেলন/২০২৬-এর দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের বক্তব্য
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী	০৮/৫/২০২৬ বাংলা একাডেমি আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তন	বাংলাদেশ পুস্তক প্রশাসক ও বিক্রেতা সমিতির ৪৪তম বার্ষিকী সভা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী	০৯/৫/২০২৬ স্থানীয় একটি হোটেল	খাদ্যনিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক ৮ম জাতীয় বৈজ্ঞানিক সম্মেলন/২০২৬ অনুষ্ঠান
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী	১৫/৫/২০২৬ কড়াইল বস্তি, ঢাকা	প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য সেবা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শিশু স্বর্গ মডেলের উদ্বোধন অনুষ্ঠান
বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী	১৭/৫/২০২৬ বিডা মাল্টিপারপাস হল	জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে পিপিপি পদ্ধতিতে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন বিষয়ে কর্মশালা
বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী	১৯/৫/২০২৬ জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রোমোশন সেন্টার, ঢাকা	বহুমুখী পাট পণ্য মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী	২৩/৫/২০২৬ ঢাকা	গাবতলী কোরবাণির হাট পরিদর্শন শেষে বক্তব্য

২. প্রতিদিনের সংসদ অধিবেশন সরাসরি প্রচার:

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন কার্যক্রম জাতীয় সংসদ ভবন থেকে প্রতিদিন সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

৩. সংবাদ

বাংলাদেশ বেতার হতে প্রতিদিন জাতীয়ভাবে ২০ মিনিট স্থিতির ২টি প্রধান বাংলা সংবাদ এবং ১০ মিনিট স্থিতির ২টি প্রধান ইংরেজি সংবাদ প্রচার করা হয়। জাতীয়ভাবে ৫ মিনিট স্থিতির ১০টি বাংলা এবং ৩টি ইংরেজি বুলেটিন প্রচারিত হয়। বেতারের আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো হতে বাংলায় ৩৭টি ৫ মিনিটের স্থানীয় সংবাদ বুলেটিন, ইংরেজিতে ৫ মিনিট স্থিতির ৩টি সংবাদ বুলেটিন এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলো হতে ১১টি ৫ মিনিট স্থিতির স্থানীয় সংবাদ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গা ভাষায় প্রতিদিন প্রচার করা হয়।

৪. বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্র হতে প্রচারিত উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানসমূহ:

- এসডিজি বিষয়ক অনুষ্ঠানসূচি (ক্ষুধা নির্মূল, অপুষ্টির অবসান ও টেকসই কৃষি, গুণগত শিক্ষা, Good Health & Wellbeing এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রচারণামূক বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে।
- পবিত্র হজ্ব বিষয়ক বিশেষ অনুষ্ঠান (হজ্ব ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ২০২৬, পবিত্র হজ্বের শর্তসমূহ, হজ্বের তাৎপর্য ও ফজিলত, হজ্বের প্রকারভেদ ও হজ্ব পালনের নিয়মসমূহ, এহরাম এর নিয়ম ও নিষিদ্ধ কার্যসমূহ, হজ্ব যাত্রীদের নিয়ে প্রামান্য প্রতিবেদন, মাসজিদুল হারামে নামাজের তাৎপর্য ও শিক্ষা; ঐতিহ্যবাহী স্থানসমূহ জেয়ারাহ বা পরিদর্শনের গুরুত্ব ; জমজম কূপের পানি পানের গুরুত্ব ও ফজিলত; মাসজিদুল নববীতে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত; সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সায়ি করার তাৎপর্য; পবিত্র শহর মক্কাতে হাজীদের করণীয়সমূহ; হাজরে আছওয়াদ-এর গুরুত্ব ও ফজিলত; মাকামে ইব্রাহিম এর তাৎপর্য ও ফজিলত; রিয়াদুল জান্নাহ'তে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত; তালবিয়া পাঠের নিয়ম, সময় ও ফজিলত এসব) বাংলাদেশ বেতার ঢাকা হতে ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচার করা হয়েছে।
- স্বাধীনতার মাস মার্চ ২০২৬ উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান (মহান স্বাধীনতার মাস মার্চ উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক কথা, মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিচারণ, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ বেতারের অবদান, মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান, স্বাধীনতাসংগ্রামে সর্বস্তরের মানুষের অবদান নিয়ে কথিকা এসব) সকল কেন্দ্র হতে ধারাবাহিকভাবে সম্প্রচার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ

- বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান: বাংলা নববর্ষ ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে প্রাসঙ্গিক কথা, বাংলা নববর্ষ নিয়ে বিশেষ কথিকা, গান, কবিতা, বৈশাখী শোভাযাত্রা নিয়ে স্পট রিপোর্টিং, শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, বিশেষ নাটক, বৈশাখের পুথি, বিশেষ গীতিনকশা, বিশেষ প্রামাণ্য: আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে নারীর হস্তশিল্প, প্রামাণ্য প্রতিবেদন- তরুণ প্রজন্মের ভাবনায় বাংলা নববর্ষ এরূপ বিভিন্ন অনুষ্ঠান সকল কেন্দ্র হতে প্রচার করা হয়েছে।
- প্রত্যাশার বাংলাদেশ: জাতীয় ভাবধারাপন্থি ও গণতান্ত্রিক আর্থসামাজিক সংস্কৃতির বিকাশে ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়েছে।
- মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান "আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান"; ছন্দে ও পঙ্‌ক্তিতে স্বাধীনতা: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে স্বরচিত কবিতা পাঠের বিশেষ অনুষ্ঠান ; হৃদয় জুড়ে বাংলাদেশ: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিনকশা; মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া; স্বাধীনতার পঙ্‌ক্তিমালা: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭১-এর কালরাত্রির গণহত্যায় শহীদদের স্মৃতি ফলক নিয়ে বিশেষ প্রামাণ্য প্রচারিত হয়েছে।
- নারীদের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান, তারুণ্যের শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্র হতে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান-'মহানগর' (ঢাকা মহানগরকেন্দ্রিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান), 'দর্পণ' (জাতীয় ঐতিহ্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক), 'উত্তরণ' (শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমসাময়িক প্রসঙ্গ) নিয়মিতভাবে প্রচারিত হয়েছে। এছাড়া সকল কেন্দ্র হতে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানসমূহ নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে।
- বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষ্যে কথিকা; গুড ফ্রাইডে উপলক্ষ্যে বিশেষ কথিকা; ইস্টার সানডে উপলক্ষ্যে বিশেষ কথিকা; জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রিড়া দিবস উপলক্ষ্যে কথিকা ; বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে কথিকা প্রচারিত হয়েছে।
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, বিশেষ গীতিআলেখ্য; কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান সকল কেন্দ্র হতে প্রচার করা হয়েছে।
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, আলোচনা অনুষ্ঠান, বিশেষ গীতি আলেখ্য, নজরুল গীতি'র আসর, নাটক ইত্যাদি প্রচারিত হয়েছে।
- 'ধর্ষণ প্রতিরোধ সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ': সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান বিভিন্ন কেন্দ্র হতে প্রচারিত হয়েছে।
- বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচান অনুষ্ঠান; বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান; বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে।
- বিশ্ব সংস্কৃতি দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে কথিকা; আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে কথিকা; বিশ্ব মেধা সম্পদ দিবস -২০২৬ উপলক্ষ্যে কথিকা; জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে কথিকা; জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে কথিকা; মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে কথিকা; বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উপলক্ষ্যে কথিকা; আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস উপলক্ষ্যে কথিকা; বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস-২০২৬ উপলক্ষ্যে কথিকা প্রচারিত হয়েছে।
- হাম সম্পর্কিত আলোচনা, প্রমো, স্লোগান, ঘোষণা, বিজ্ঞপ্তি ও জরুরি বার্তা ঘনঘন প্রচার করে হাম বিষয়ে জনগণকে সতর্ক ও সচেতন করা হচ্ছে এবং এখনো চলমান আছে।
- এছাড়া ডায়রিয়া, কলেরা ও ডেঙ্গুজ্বর, সিআইডি বাংলাদেশ কর্তৃক সরবরাহকৃত নিখোঁজ সংবাদ, নারী ও শিশু পাচার রোধ, নারী ও যু সমাজের উন্নয়ন, যৌতুকবিরোধী প্রচারণা, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও পাচাররোধ, যক্ষ্মা, স্যানিটেশন, জন্মনিবন্ধন, ভিটামিন-এ ক্যাপসুল, দুর্নীতি দমন, সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ, বিশুদ্ধ পানি, বিদ্যুৎ অপচয় রোধ, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের পুনর্বাসন, নারী ও শিশু অধিকার, প্রাথমিক শিক্ষা, গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য, দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য নাটিকা/জীবন্তিকা এবং অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে জিঙ্গেল, স্লোগান, গান ও স্পট নিয়মিতভবে সকল কেন্দ্র হতে প্রচার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বেতারের শ্রোতা সম্পৃক্ততার সংক্ষিপ্ত চিত্র (এপ্রিল ২০২৬)

বাংলাদেশ বেতারের ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং ৭টি ইউনিটের অনুষ্ঠান ও বার্তা শাখা থেকে প্রচারিত প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান ও সংবাদের শ্রোতা-প্রিয়তা প্রতিবেদন অনুযায়ী এপ্রিল/২০২৬ মাসে নিউ মিডিয়ায় (ফেসবুক ফলোয়ার/কনেটেন্ট, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, ভিউ এবং ইউটিউব সাবস্ক্রাইবার/কনটেন্ট ভিউ) প্রাপ্ত মোট ফিডব্যাকের সংখ্যা ৬,২১,৫২,৪০২।

- এপ্রিল/২০২৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারের ফেসবুক পেইজসমূহের মোট ফলোয়ারের সংখ্যা ১৪,০৭,৫৬৪ জন;
- বাংলাদেশ বেতার থেকে এপ্রিল/২০২৬ মাসে মোট ৪,৪৭৯ কনটেন্ট ফেসবুকে আপলোড করা হয়েছে;
- এইসব কনটেন্টসমূহে মোট পোস্ট রিচ এর পরিমাণ ৪,৮৭,৮৯,১১৪;
- ফেসবুকের কনটেন্টসমূহে মোট লাইক সংখ্যা ১৬,৯৭,২৬৯ লাইক
- ফেসবুকের কনটেন্টসমূহে মোট কমেন্ট সংখ্যা ৬২,৭৯৪;
- সর্বমোট ৫,৬৬,৩৪,৬৫৮ বার ভিউ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র ও ইউনিটের ইউটিউব চ্যানেলে এপ্রিল/২০২৬ মাসে মোট সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ১,৬৫,৯৫৩ জন এবং এপ্রিল/২০২৬-এ মোট ১,৮২৪ কন্টেন্ট বাংলাদেশ বেতারের ইউটিউব চ্যানেলসমূহে আপলোড করা হয়েছে। ইউটিউব কনটেন্টসমূহ ১৭,০১,৭৬৯ বার ভিউ করা হয়েছে এবং ওয়াচ টাইম ১০,০০২.৪ ঘন্টা।

এপ্রিল ২০২৬-এ ফেসবুক পেইজের অবস্থা

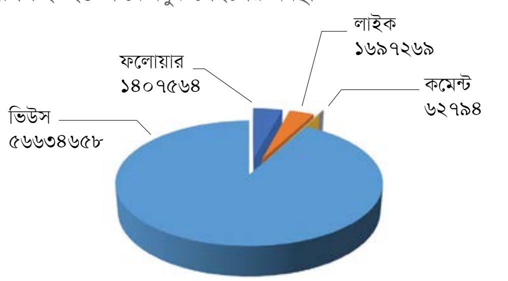

এপ্রিল ২০২৬-এ ইউটিউব চ্যানেলের অবস্থা

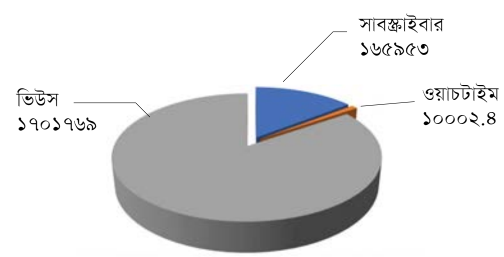

মার্চ ও এপ্রিল/২০২৬-এ নিউ মিডিয়ায় প্রাপ্ত ফিডব্যাকের তুলনামূলক চিত্র

ক্রম	ফিডব্যাকের মাধ্যম		মার্চ ২০২৬	এপ্রিল ২০২৬	হ্রাস/বৃদ্ধি	মন্তব্য
১.	ফেসবুক পেইজ	ফলোয়ার	১৩,৪২,৭৮৮	১৪,০৭,৫৬৪	বৃদ্ধি পেয়েছে	
২.		লাইক	১১,৪৭,৪০৩	১৬,৯৭,২৬৯	বৃদ্ধি পেয়েছে	
৩.		কমেন্ট	৪৬,৯৪৮	৬২,৭৯৪	বৃদ্ধি পেয়েছে	
৪.		শেয়ার	৩৫,৭৫১	৭৯,৮০০	বৃদ্ধি পেয়েছে	
৫.		ভিউস	২,৯৬,৫৪,৯৬৪	৫,৬৬,৩৪,৬৫৮	বৃদ্ধি পেয়েছে	
৬.	ইউটিউব	সাবস্ক্রাইবার	১,৬২,৫০১	১,৬৫,৯৫৩	বৃদ্ধি পেয়েছে	
৭.		ওয়াচটাইম	১০,৩১১.৩	১০,০০২.৪	হ্রাস পেয়েছে	
৮.		ভিউস	৯,৫৩,৬৬৭	১৭,০১,৭৬৯	বৃদ্ধি পেয়েছে	
৯.	অ্যাপস/ওয়েবসাইট ব্যবহারকারী		৪,৭৪,৪২৭	৩,৯২,৫৯৩	হ্রাস পেয়েছে	
	মোট		৩,৩৮,২৮,৭৬০.৩	৬,২১,৫২,৪০২.৪	বৃদ্ধি পেয়েছে	

মার্চ ও এপ্রিল/২০২৬ মাসে বাংলাদেশ বেতার থেকে নিউ মিডিয়ায় আপলোডকৃত অনুষ্ঠান এবং পোস্ট রিচ

ক্রম	ফিডব্যাকের মাধ্যম		মার্চ ২০২৬	এপ্রিল ২০২৬	হ্রাস/বৃদ্ধি	মন্তব্য
১.	ফেসবুক পেইজ	আপলোডেড পোস্ট	৩,৮৯৫	৪,৪৭৯	বৃদ্ধি পেয়েছে	
২.		পোস্ট রিচ	২,৬৯,৬৬,০৫৯	৪,৮৭,৮৯,১১৪	বৃদ্ধি পেয়েছে	
৩.	ইউটিউব	আপলোডেড ভিডিও	১,৮৯৫	১,৮২৪	হ্রাস পেয়েছে	

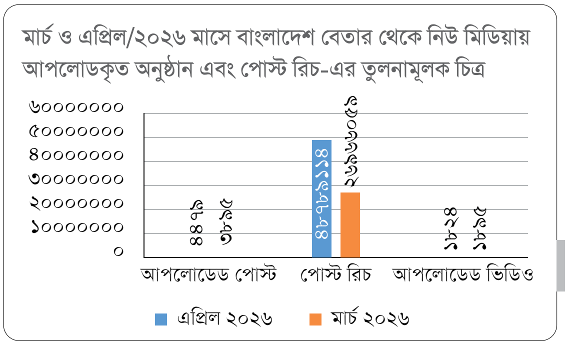

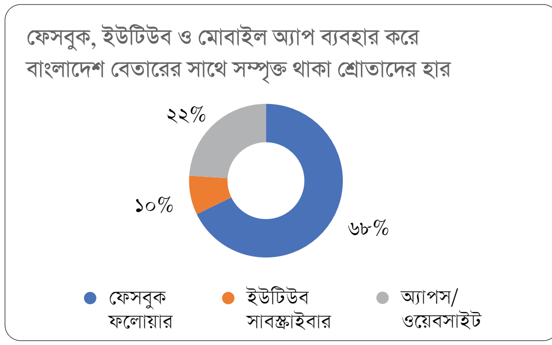

মার্চ ও এপ্রিল/২০২৬ মাসে প্রচলিত মাধ্যমে প্রাপ্ত ফিডব্যাকের তুলনামূলক ছক

ক্রম	ফিডব্যাকের মাধ্যম		মার্চ ২০২৬	এপ্রিল ২০২৬	হ্রাস/বৃদ্ধি	মন্তব্য
১.	প্রচলিত মাধ্যম	চিঠি	৩,০৬২	৩,২৫৬	বৃদ্ধি পেয়েছে	
২.		ই-মেইল	৮,৭২৪	৯,৫৬০	বৃদ্ধি পেয়েছে	
৩.		ফোন	২,৬৮৯	৩,৫৮০	বৃদ্ধি পেয়েছে	
৪.		এসএমএস	৬,১৩৪	৫,৮৯৮	হ্রাস পেয়েছে	
৫.		অন্যান্য	-	-	-	
	মোট	**পোস্ট রিচ**	**২০,৬০৯**	**২২,২৯৪**	**বৃদ্ধি পেয়েছে**	

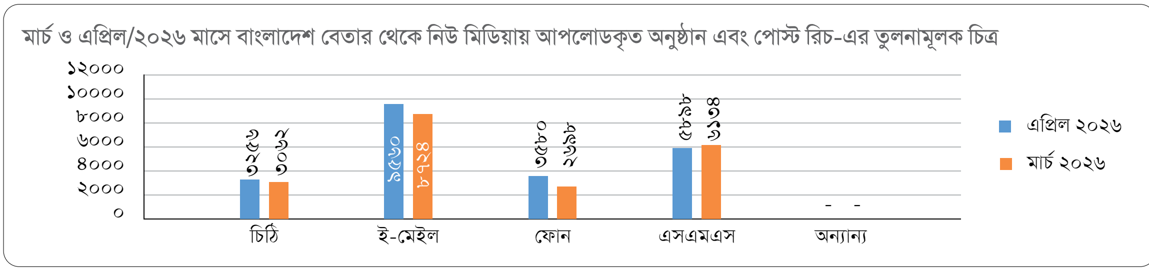

মার্চ ও এপ্রিল/২০২৬ মাসে কেন্দ্রভিত্তিক মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারকারীর তুলনামূলক চিত্র

ক্রম	কেন্দ্র/ইউনিট	এএম	এফএম	এপ্রিল ২০২৬	মার্চ ২০২৬	হ্রাস/বৃদ্ধি
১.	বাংলাদেশ বেতার ঢাকা	৫৯,৯৫২	২৬,২৬৪	৮৬,২১৮	১,৫৪,৫৬৯	হ্রাস পেয়েছে
২.	বাংলাদেশ বেতার চট্টগ্রাম	১২,৬০৫	১৫,৩২৪	২৭,৯২৯	৩৬,১২৯	হ্রাস পেয়েছে
৩.	বাংলাদেশ বেতার রাজশাহী	২০,৮১৩	১০,৯৩৯	৩১,৭৫২	৩৮,০৩৫	হ্রাস পেয়েছে
৪.	বাংলাদেশ বেতার খুলনা	৯,৫০৩	৫,৮৩২	১৫,৩৩৫	২৮,৮৮৮	হ্রাস পেয়েছে
৫.	বাংলাদেশ বেতার রংপুর	৭,৬৩৬	৮,৬৬৩	১৬,২৯৯	১৩,৩১৪	বৃদ্ধি পেয়েছে
৬.	বাংলাদেশ বেতার সিলেট	৫,৫১৬	৫,১৭৬	১১,৬৯২	১০,৮৭১	বৃদ্ধি পেয়েছে
৭.	বাংলাদেশ বেতার বরিশাল	৩,৬০৩	৪,০১৯	৭,৬২২	৯,২৭২	হ্রাস পেয়েছে
৮.	বাংলাদেশ বেতার ঠাকুরগাঁও	২৫,৪৬৬	২৬,০৮০	৫১,৫৪৬	৭,০৩৩	বৃদ্ধি পেয়েছে
৯.	বাংলাদেশ বেতার রাঙ্গামাটি	১,৮৭৮	১,৫০০	৩,৩৭৮	১,৭৯৫	বৃদ্ধি পেয়েছে
১০.	বাংলাদেশ বেতার বান্দরবান	১,৭১৭	২,১৪০	৩,৮৫৭	৫,৪৯৬	হ্রাস পেয়েছে
১১.	বাংলাদেশ বেতার কক্সবাজার	২,১৪২	৩,২১০	৫,৩৫২	৬,৪০০	হ্রাস পেয়েছে
১২.	বাংলাদেশ বেতার কুমিল্লা	২,৫০১	২,৭৯৯	৫,৩০০	৬,৮৫৪	হ্রাস পেয়েছে
১৩.	বাংলাদেশ বেতার গোপালগঞ্জ	প্রযোজ্য নয়	৪,১০৭	৪,১০৭	৫,২৪০	হ্রাস পেয়েছে
১৪.	বাংলাদেশ বেতার ময়মনসিংহ	প্রযোজ্য নয়	৪,০৬২	৪,০৬২	৫,৬৭১	হ্রাস পেয়েছে
১৫.	বাণিজ্যিক কার্যক্রম	-	-	৭৮,৩৮৯	৯০,৫৮১	হ্রাস পেয়েছে
১৬.	ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম	প্রযোজ্য নয়	-	৩৫,১৫৯	৪৭,০৬৪	হ্রাস পেয়েছে
১৭.	বহির্বিশ্ব কার্যক্রম (অনলাইন/অ্যাপস)	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৪,৫৯৬	৭,২১৫	হ্রাস পেয়েছে
	মোট			**৩,৯২,৫৯৩**	**৪,৭৪,৪২৭**	**হ্রাস পেয়েছে**

বেতার সংবাদ

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিলের আয়োজন

গত ২ জুন ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ বেতারের উদ্যোগে মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক জনাব এ এস এম জাহীদ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারের অতি. মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) জনাব শাহনাজ বেগম, অতি. মহাপরিচালক (বার্তা) জনাব মুহাম্মদ শরীফুল কাদের, অতি. প্রধান প্রকৌশলী জনাব প্রবাল কান্তি দাশ,

বাংলাদেশ বেতারের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কর্মময় জীবন, দেশপ্রেম ও জাতীয় উন্নয়নে তাঁর অবদানের কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক জনাব এ এস এম জাহীদ স্বাধীনতার ঘোষক শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। তিনি বলেন, উৎপাদনমুখী অর্থনীতি তথা সবুজ বিপ্লব, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শহিদ জিয়ার অবদান চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য সবাই মিলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

দোয়া মাহফিলে দেশবাসীর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া ও আরাফাত রহমান কোকোর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন জনাব কারি মো. এমদাদুল হক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম।

‘ডিজিটাল যুগে বাংলাদেশ বেতারের রূপান্তর ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২০ মে ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ বেতারের উদ্যোগে ‘ডিজিটাল যুগে বাংলাদেশ বেতারের রূপান্তর ও সম্ভাবনা’ শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গ্রেড-১) জনাব মো. ইয়াসিন।

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক জনাব এ এস এম জাহীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা) জনাব মুহাম্মদ শরীফুল কাদের। বাংলাদেশ বেতারের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে মুখ্য আলোচক ছিলেন তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা জনাব সৈয়দ আবদাল আহমদ। অন্যান্য আলোচকের মধ্যে ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) জনাব শাহনাজ বেগম এবং প্রধান প্রকৌশলী জনাব মুনীর আহমদ। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ সেমিনারের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং আলোচকবৃন্দ এবং প্রধান অতিথি সেগুলো আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশ বেতারের ডিজিটাল রূপান্তরের ক্ষেত্রে গবেষণার ওপর জোর দেন। বর্তমান সরকার শিগ্গিরই নিউ মিডিয়া নীতিমালা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেতার এর সুচিন্তিত মতামত পেশ করার নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ বেতার যদি এমন একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে পারে, যেটা বেতারের ডিজিটাল রূপান্তরে অবদান রাখতে পারবে, সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় সব রকম সহযোগিতা করবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। সময়ের পরিবর্তনে মিডিয়াকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সকলের থাকা দরকার বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সেমিনারে মুখ্য আলোচক প্রধান তথ্য কর্মকর্তা জনাব সৈয়দ আবদাল আহমদ বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান ও সংবাদসমূহ আরো সময়োপযোগী ও সহজে শোনা যায়, সে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন জনাব কারি মো. এমদাদুল হক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম।

উপমহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) জনাব মো. আরিফুল ইসলামের বিদায় সংবর্ধনা

গত ২০ মে ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার অডিটোরিয়ামে উপমহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) জনাব মো. আরিফুল ইসলামের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

তিনি ১৯৬৭ সালের ৯ মে ফরিপুরের নগরকান্দা উপজেলার বাণেশ্বরদী গ্রামে নানাবাড়িতে জন্মগ্রহন করেন। তিনি বিসিএস (তথ্য) ১৫তম ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ১৫ নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে অনুষ্ঠান সংগঠক হিসেবে বাংলাদেশ বেতারে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্র ও ইউনিটে দায়িত্ব পালন করেন এবং উপমহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনের নির্বাহী প্রযোজক এবং প্রোগ্রাম ম্যনেজার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএজিডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক জনাব এ এস এম জাহীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (বার্তা) জনাব মুহাম্মদ শরীফুল কাদের,

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) জনাব শাহনাজ বেগম এবং প্রধান প্রকৌশলী জনাব মুনীর আহমদ, বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তাগণ তাঁর সঙ্গে কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক জনাব এ এস এম জাহীদ তাঁর ও তাঁর পরিবার সদস্যদের সুস্থ ও শান্তিময় জীবন কামনা করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন পরিচালক (নিউ মিডিয়া) জনাব ড. মো. হারুন অর রশীদ এবং আঞ্চলিক পরিচালক জনাব তানিয়া খান।

রংপুরে বেতার সংবাদশিল্পী ফোরামের বর্ষপূর্তি উদযাপন

গত ২০ জুন দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যদিয়ে বেতার সংবাদশিল্পী ফোরাম, রংপুর-এর সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার রংপুর সম্প্রচার ভবনে শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও কেককাটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বেতার রংপুর-এর পরিচালক মুহাম্মদ মঈদ উদ্দিন।

বেতার সংবাদশিল্পী ফোরামের সভাপতি এস এম রেজাউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক পরিচালক মোঃ রাশেদ খান, আঞ্চলিক প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহেদুজ্জামান এবং উপবার্তা নিয়ন্ত্রক ও ফোরামের প্রধান উপদেষ্টা রাশেদ ফয়সল কবীর বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বেতার সংবাদশিল্পী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এ এ এম মুনির চৌধুরী এবং বর্ষপূতি উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও ফোরামের প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক ফরহাদুজ্জামান ফারুক।

আলোচনা সভা শেষে ফোরামের সদস্যরা গান, আবৃত্তি, কৌতুক পরিবেশন করেন। পরে অতিথিরা সকলে মিলে কেক কাটেন। বাংলাদেশ বেতার রংপুরের আঞ্চলিক বার্তা সংস্থায় কর্মরত সংবাদদাতা, অনুবাদক ও সংবাদ পাঠকসহ সহযোগী কলাকুশলীদের নিয়ে ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বেতার সংবাদশিল্পী ফোরাম।

বেতার বাংলার সহ-সম্পাদক মিয়া সালাহউদ্দিন-এর ইন্তেকাল

বেতার বাংলার প্রাক্তন সহ-সম্পাদক মিয়া সালাহউদ্দিন ২০ মে ২০২৬ তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি লিভার ও প্যানক্রিয়াসের জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

তিনি দীর্ঘদিন বেতার বাংলার সহ-সম্পাদক এবং দৈনিক প্রভাত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ বেতারের সংবাদ পাঠক ও অনুষ্ঠান উপস্থাপক ছিলেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রে পাণ্ডুলিপি লেখক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেন।

তিনি স্বাধীনতার পর কবিতা ও ছোট গল্প লেখা শুরু করেন। পরে তিনি সাংবাদিকতা পেশার সাথে যুক্ত হন। কাজ করেন দৈনিক বাংলার মুখ, জনপদ, নভ অভিযান, সাপ্তাহিক রিপোর্টার ও ফসল, সাপ্তাহিক হককথা, তারকালোক ও শিশুতোষ পত্রিকা কিশোর জগত-এ। তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশনে গেস্ট প্রোডিউসার হিসেবে কাজ করেছেন।

বাংলাদেশ বেতার মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

বেতার অ্যালবাম

কিছু স্থিরচিত্র

৫ জুন ২০২৬ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান, এমপি এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ইশরাক হোসেন, এমপি চট্টগ্রাম স্বাধীনতা কমপ্লেক্স ও বাংলাদেশ বেতার কালুরঘাট কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন রেজিস্টারে স্বাক্ষর করেন

১৭ জুন ২০২৬ তারিখে শিশু, কিশোর-কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "নিউমিডিয়া ও বেতার অনুষ্ঠান ভাবনা" বিষয়ক কর্মশালায় বেতারের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানা

২৪ জুন ২০২৬ তারিখে ফরিদপুরের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী লাইলী বেগমকে বাংলাদেশ বেতারের শিল্পী হিসাবে অন্তর্ভুক্তির চিঠি প্রদান করেন মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ। সাথে আছেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান) শাহানাজ বেগম, উপ মহাপরিচালক (অনুষ্ঠান), মোঃ বশির উদ্দিন এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল থেকে প্রচারিত বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান "হৃদয়ে শহিদ জিয়া"

২ জুন ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ বেতারের বাণিজ্যিক কার্যক্রম ইউনিটের স্টুডিওতে গীতিকার ফখরুল করিমের লেখা গানে কণ্ঠ দিয়েছেন সামিনা চৌধুরী। সুরকার আব্দুল্লাহ খান, শব্দগ্রহণে শফিকুর রহমান রুবেল

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার বিশেষ অনুষ্ঠান 'হৃদয়ে জাগ্রত শহিদ জিয়া' গান রেকর্ডিংয়ে কণ্ঠশিল্পী মনির খান

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকার বিশেষ অনুষ্ঠান 'হৃদয়ে জাগ্রত শহিদ জিয়া' গান রেকর্ডিংয়ে কণ্ঠশিল্পী মিজান মাহমুদ রাজিব ও প্রিয়াংকা বিশ্বাস এবং বাংলাদেশ বেতারের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো: রুবাইয়াত শামীম চৌধুরী

বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা, স্বাধীনতার ঘোষক শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ কাব্যালেখ্য 'কোটি হৃদয়ে শহিদ জিয়া'। পরিবেশনায় জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস), মহানগর, রাজশাহী

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী কেন্দ্রে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান 'নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান'

কৃষি সার্ভিস দপ্তরের আয়োজনে জতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নজরুল সঙ্গীতশিল্পী সালাউদ্দিন আহমেদ ও মিরাজুল জান্নাত সোনিয়া

শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে বাংলাদেশ বেতার বরিশাল কেন্দ্র

১৩ মে ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে একটি আধুনিক গান রেকর্ডিংয়ের সময় কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌস আরা এবং সুরকার মোঃ সাদেক আলী

৩ জুন ২০২৬ তারিখে স্বাস্থ্য বিষয়ক ফোন-ইন অনুষ্ঠান: রোগ জিজ্ঞাসা। অংশগ্রহণে: অধ্যাপক ডা. মো. জয়নুল ইসলাম, নিউরো সার্জন ও বিভাগীয় প্রধান (ডানে), অধ্যাপক ডা. মো. শফিউল ইসলাম, নিউরো সার্জন, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস ও হাসপাতাল (বাঁয়ে) সঞ্চালনায়: ডা. রেজাউল আলম খান (মাঝে)

খালেদা জিয়া

পরিচ্ছন্ন রাজনীতির জননী ও আপসহীনতার এক মহাকাব্য

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বেগম খালেদা জিয়া একজন অবিস্মরণীয় সত্তা। তাঁর রাজনৈতিক জীবন কেবল রাষ্ট্রক্ষমতার পালাবদল নয়, বরং তা ত্যাগ, দেশপ্রেম এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের গল্প। ১৯৮১ সালে এক মর্মান্তিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে স্বামী শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হারানোর পর তিনি যখন রাজনীতির অঙ্গনে পা রাখেন, তখন তাঁর সামনে ছিল কণ্টকাকীর্ণ পথ। একজন সাধারণ গৃহবধূ থেকে রাজপথের 'দেশনেত্রী' হয়ে ওঠার এই দীর্ঘ যাত্রায় তিনি যে দৃঢ়তা ও সততার পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁকে এ দেশের রাজনীতিতে 'পরিচ্ছন্ন রাজনীতির জননী' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বেগম খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক উত্থানের মূল ভিত্তি ছিল নয় বছরের দীর্ঘ স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন। ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি যেভাবে রাজপথে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তা সমকালীন ইতিহাসে বিরল। সেই দীর্ঘ সময়ে তাঁকে বহুবার কারারুদ্ধ ও গৃহবন্দি করা হয়েছে, টোপ দেওয়া হয়েছে ক্ষমতার। কিন্তু তিনি আপস করেননি। তাঁর এই 'আপসহীন' অবস্থানই বাংলাদেশের মানুষের মনে এক বিশাল আস্থার জায়গা তৈরি করে দেয়। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর তাঁর আপসহীন সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয়ে এ দেশে স্বৈরাচারের পতন ঘটে এবং রুদ্ধ হওয়া গণতন্ত্রের দ্বার পুনরায় উন্মোচিত হয়।

১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন করার এক বৈপ্লবিক উদ্যোগ নেন। তাঁর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সাফল্য ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থা বিলোপ করে সকল ক্ষমতা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ন্যস্ত করেন। এই একক সিদ্ধান্তটিই তাঁকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়, কারণ

তিনি ক্ষমতার কেন্দ্রীভূত রূপের চেয়ে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন। তাঁর এই পদক্ষেপ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ ধারার সূচনা করে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারে বেগম খালেদা জিয়ার অবদান যুগান্তকারী। তাঁর শাসনকালেই বাংলাদেশে আধুনিক বাজার অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত হয়। ১৯৯১ সালে প্রথম বারের মতো 'মূল্য সংযোজন কর' বা ভ্যাট প্রবর্তন ছিল একটি সাহসী ও দূরদর্শী অর্থনৈতিক পদক্ষেপ। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে উজ্জ্বল অবদান ছিল শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নে। মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা এবং উপবৃত্তি কর্মসূচি চালুর ফলে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হারে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আসে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা এবং 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' কর্মসূচির মাধ্যমে তিনি প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেন।

বেগম খালেদা জিয়ার প্রশাসনিক সততা এবং এতিমদের অধিকার রক্ষায় তাঁর কঠোর অবস্থানের একটি উদাহরণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। শহিদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ তখন সমাজকল্যাণমন্ত্রী হিসেবে এতিমখানাগুলোর তদারকি করতেন। একদিন একটি এতিমখানায় আকস্মিক পরিদর্শনে গিয়ে তিনি দেখেন, বাচ্চাদের খাবারের তালিকায় থাকা ইলিশ মাছের বদলে পচা সিলভার কার্প রান্না করা হচ্ছে। মন্ত্রী যখন সেই অসাধু পরিচালককে শোকজ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যান, তখন বেগম খালেদা জিয়ার প্রতিক্রিয়া ছিল বিস্ময়কর। শোকজের কথা শুনে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছিলেন, "এতিমের খাবার নিয়ে যে এরকম করে, তাকে আবার শোকজ কী! আপনি রাস্তায় থাকার সময়ই আমি তার বহিষ্কার আদেশ রেডি করিয়েছি।" এতিমের অধিকার রক্ষায় তাঁর এই বজ্রকঠিন অবস্থান প্রমাণ করে তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কতটা আপসহীন ছিলেন।

কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! যে নেত্রী এতিমের মুখে ভালো খাবার তুলে দিতে নিজের দলের পরিচয়ধারী ব্যক্তির বিরুদ্ধেও তাৎক্ষণিক বহিষ্কার আদেশ ও আইনানুগ ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁকে শেষ জীবনে এসে তথাকথিত 'এতিমের মাল আত্মসাতের' এক বানোয়াট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় বছরের পর বছর নির্জন কারাবাস ভোগ করতে হয়েছে। কেবল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এই মিথ্যা মামলায় তাঁকে বন্দি করে রাখা ছিল ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়।

জাতীয়তাবাদ ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে তিনি বরাবরই ছিলেন অটল। শহিদ জিয়া প্রবর্তিত 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' দর্শনকে তিনি তাঁর রাজনীতির মূলমন্ত্র হিসেবে ধারণ করেছিলেন। তাঁর পররাষ্ট্রনীতি ছিল সব সময়ই দেশের স্বার্থকে কেন্দ্রে রেখে। যমুনা বহুমুখী সেতুর মতো মেগা প্রকল্পের নির্মাণকাজ ত্বরান্বিত করা এবং দেশব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন তাঁর উন্নয়নমুখী রাজনীতির পরিচয় বহন করে। একজন নেত্রীর সার্থকতা কেবল তাঁর শাসনকালেই নয়, বরং তাঁর ত্যাগের গভীরতায় পরিমাপ করা হয়। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বেগম খালেদা জিয়াকে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিকভাবে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। ক্ষমতা থেকে দূরে থাকাকালে তাঁকে বারবার কারাবরণ করতে হয়েছে, নিজের দীর্ঘদিনের স্মৃতিবিজড়িত ঘর ছাড়তে হয়েছে এবং চরম শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তিনি লড়াই চালিয়ে গেছেন।

বর্তমান সময়ে রাজনীতি যখন নীতি-আদর্শের চেয়ে সুবিধাবাদ ও প্রতিহিংসার ওপর বেশি নির্ভরশীল, তখন বেগম খালেদা জিয়ার দীর্ঘ বর্ণাঢ্য জীবন নতুন প্রজন্মের জন্য এক শিক্ষা। এশিয়ার প্রথম মুসলিম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির মতো বৃহৎ দলের ৪১ বছর টানা নেতৃত্বদানকারী এই নেত্রী প্রমাণ করেছেন, জনগণের ভালোবাসা আর নিজের সততা থাকলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মাথা উঁচু করে টিকে থাকা যায়। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর ছোটখাটো ভুল হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু দেশপ্রেমে তিনি ছিলেন নিখাদ। তিনি সগৌরবে বলতে পেরেছিলেন, "বাংলাদেশের বাইরে আমার আর কোনো ঠিকানা নেই"। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং বাংলাদেশের নিজস্ব সত্তা রক্ষার আন্দোলনে তিনি আজীবন এক জননীসম ছায়া হয়ে থাকবেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

জনি সিদ্দিক
সালনা, গাজীপুর

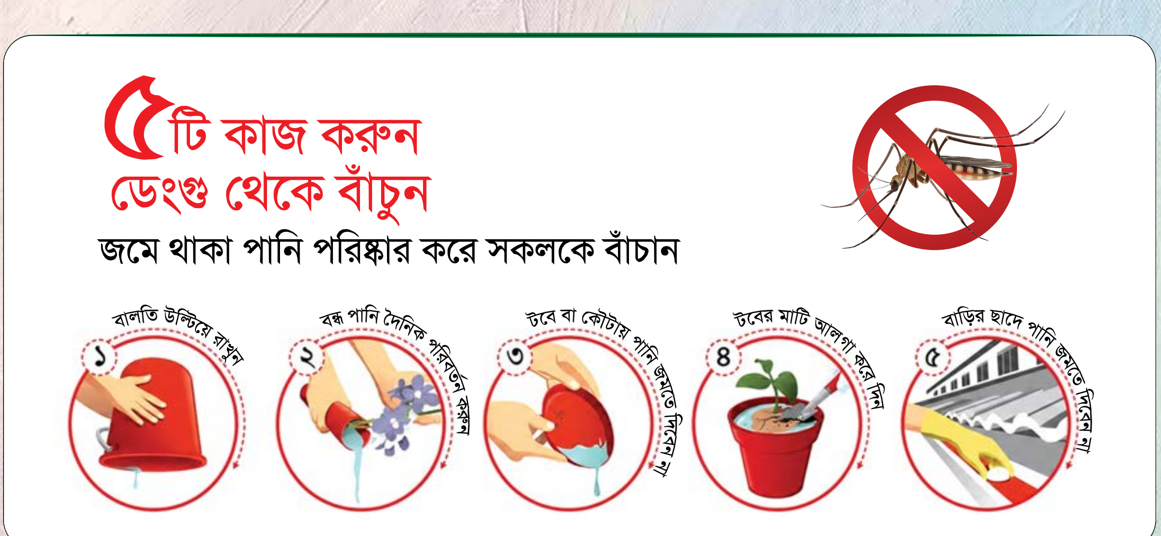

অবিনাশী জ্যোতিষ্ক

তিমির চিরে উদয় জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রনাথ,
বাল্যকালে সয়েছিলেন শোকের কঠিন ঘাত।
একলা পথে অটল থেকে তেজস্বী সেই রবি,
শব্দ-রঙে আঁকলেন এই বিশ্বলোকের ছবি।
সোনার মাটির মায়ার টানে নাড়ির নিবিড় যোগ,
পল্লিসুরের সার্থকতা পরম উপভোগ,
কাব্য-বনে ঝরনাধারায় সুরের ছোঁয়া ঢালে,
গীতাঞ্জলি, গীতবিতানে শ্রেষ্ঠ রবি জ্বলে।
সোনার তরী, বলাকার সুর…মায়াবী এক রেশ,
লেখনীতেই গড়লেন কবি ভুবন অশেষ।
প্রকৃতিতে পরম প্রেমে পরশমণি ঘর,
অক্ষরে তাঁর পাওয়া গেল অমরত্বের বর।
আমার সোনার বাংলা হয়ে ছড়ান প্রাণের প্রীতি,
বাঙালির এই মণিকোঠায় রেখে গেলেন স্মৃতি।
উপন্যাস ও গল্পকথায় সাজিয়ে দিলেন সবই,
মহাকাশের নীল গহিনে অন্তহীন এক রবি।

মো. আব্দুল কাদের
শিক্ষক, সারিয়াকান্দি, বগুড়া

সত্য মিথ্যা

সত্য সদাই নিমের তিতা
মিত্র শত্রু ভাবে
সত্য ছাড়া বলো দেখি
মুক্তি ক্যামনে পাবে?

সত্য পারে মুক্তি দিতে
মিথ্যা করে ধ্বংস
সত্য কথা শুনতে চায় না
এজিদের সে বংশ।

মিথ্যা দিয়ে বড়াই করে
চলছো দিনে রাতে
অভিশপ্ত জীবন তোমার
লাভ কী আছে তাতে?

সত্য যাদের বক্ষে ছিল
তাদের স্মরণ করি
এসো আমরা সত্য পথে
জীবনটাকে গড়ি।

মিথ্যা যতই মধুর হোক না
বলব না তা মুখে
সত্য নিয়ে মরণ ভালো
থাকবে তুমি সুখে।

রাকিব হোসাইন
কচুয়া, বাগেরহাট

মাটির ডাকে রবীন্দ্রনাথ

১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিক। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির দোতলার লম্বা বারান্দার এক কোণে এসে বসেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বয়স হয়েছে, শরীরে আগের সেই জোর নেই, কিন্তু চোখের চাউনিতে এখনো সেই পুরোনো গাম্ভীর্য। তিনি ভৃত্যকে ডেকে বললেন–
"এই ছোটবাবুকে একটু আসতে বল তো!"

ভৃত্য–
"জি আচ্ছা মহাশয়"

এই বলে সে প্রায় দৌড়ের মতো করে চলে গেল।

রবীন্দ্রনাথের ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। ভেতরে না ঢুকেই, দরজার গোঁড়ায় দাঁড়িয়ে–
"ছোটবাবু ওই যে মহর্ষি ডাকতেছেন আপনাকে।"

একটু থেমে আবার বলল–
"এখনই যেতে কইছেন, দেরি না করে।"

রবীন্দ্রনাথ কলম নামিয়ে মুখ তুলে তাকালেন।

ভৃত্য আবার বলল–
"ছোটবাবু, মহর্ষি আপনাকে যেতে কইছেন।"

রবীন্দ্রনাথ ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন।

ভৃত্য তখনো দাঁড়িয়ে, আবার বলে–
"চলেন ওনার ঘরে"

রবীন্দ্রনাথ বললেন–
"হ্যাঁ, যাচ্ছি।"

ভৃত্য আর কিছু না বলে সামনে হাঁটা শুরু করল, যেন একটু তাড়াহুড়ো করেই যাচ্ছে।

আটাশ বছরের যুবক রবীন্দ্রনাথ ধীরপায়ে মহর্ষির ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। পরনে সাধারণ ধুতি আর চাদর। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নিচু গলায় বললেন–
"বাবা, ডেকেছেন?"

মহর্ষি তাঁর দীর্ঘ দাড়িটা হাত দিয়ে সামান্য নেড়ে রবির দিকে তাকালেন। কোনো ভূমিকা না করেই শান্ত কিন্তু ভারী গলায় বললেন–
"হ্যাঁ রবি, বসো। তোমাকে একটা জরুরি কাজের কথা বলতে ডেকেছি। এবার তোমাকে নদীয়া আর পাবনার জমিদারি দেখভালের কাজটা বুঝে নিতে হবে। সাজাদপুর আর শিলাইদহের দিকে অনেক দিন ধরে কোনো নজর দেওয়া হয়নি। কেবল কলকাতা আর সাহিত্য নিয়ে পড়ে থাকলে তো চলবে না, এবার প্রজাদের ঘরের খবর নিতে শেখো।"

বাবার এই বৈষয়িক আদেশের কথা শুনে রবির মনের ভেতরটা একটু কেঁপে উঠল। তিনি বিনীতভাবে আমতা আমতা করে বললেন–
"কিন্তু বাবা, জমিদারি পরিচালনার তো কোনো অভিজ্ঞতা আমার নেই। নায়েব-গোমস্তাদের ওই হিসাবপত্রের জটিলতা আমি কীভাবে সামলাব?"

মহর্ষি রবির দ্বিধা বুঝতে পারলেন। তাঁর মুখে একটা আশ্বাসের ভাষা ফুটে উঠল। তিনি বললেন–
"অভিজ্ঞতা তো আর এমনি এমনি আসে না রবি, কাজে নামলে তবেই শেখা যায়। তুমি কলকাতায় বসে নায়েবদের পাঠানো হিসাবপত্র আর চিঠিপত্র আগে ভালো করে দেখো, ক'দিন পরে নিজে গিয়ে সরেজমিনে সব তদারক করবে। কোনো সমস্যায় পড়লে তো আমি আছিই।"

বাবার মুখে এই কথা শোনার পর রবির আর কিছু বলার সাহস বা অবকাশ রইল না। তিনি শুধু মাথা নিচু করে বললেন–
"যে আজ্ঞা, বাবা। আমি গোছগাছ করে নিচ্ছি।"

মহর্ষির ঘর থেকে বেরিয়ে রবি নিজের ঘরে ফিরে এলেন। তারপর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে রবির পিঠে হাত রাখলেন। বড়দাদার চুল-দাড়ি কাঁচা-পাকা, চোখে একটা স্নেহশীল চাউনি। তিনি একটু হেসে বললেন–

"কি রে রবি, মন খারাপ হয়েছে? বাবার ডাক শুনেই বুঝেছিলাম জমিদারি নিয়ে কোনো বড় সিদ্ধান্ত হয়েছে। কলকাতার এই আড্ডা, বন্ধুদের আসর ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, তাই না? কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস, মাঠ-ঘাটের কাদা-ধুলো না মাখলে মাটি-মানুষের আসল রূপ চেনা যায় না। তবে হ্যাঁ, কাছারিঘরের ওই নায়েব-গোমস্তাদের মুখের কথায় সব সময় কান দিস না। ওরা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকে।"

রবি বড়দাদার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি নিজের ঘরের টেবিলের ওপর খোলা থাকা খাতাটার দিকে তাকালেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি খাতাটা বন্ধ করলেন। ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের উঠোনটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু হলো কয়েক দিন পরেই। প্রথমে ট্রেনে করে কুষ্টিয়া, তারপর সেখান থেকে ঘাট পেরিয়ে একটা সাধারণ দেশি হাউজবোটে করে শিলাইদহের কুঠিবাড়ির দিকে রওনা হওয়া। একাই রওনা হলেন তরুণ রবি। তবে বাবার নির্দেশ আর নায়েবদের পাঠানো হিসাবের খেরোখাতা তাঁর সঙ্গে ছিল। কোন চরের মাটি কেমন, কোন প্রজাদের অবস্থা কেমন, কার কাছ থেকে কীভাবে খাজনা আদায় করতে হয় সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝে নিতে লাগলেন তিনি।

বোটের কেবিনে একা বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন অপলকে। চারপাশে এক অন্য পৃথিবী। নদীর জল তখনো বর্ষার রেশ ধরে রেখে ছলাৎ ছলাৎ শব্দে বোটের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে। রবি দেখেন চরের বুকে কাশবনের মেলা, জেলেনৌকো হুটহাট ভেসে যাওয়া, আর ঘাটে জল নিতে আসা গাঁয়ের বধূদের কোলাহল। কিন্তু এই রূপের আড়ালে যে মানুষের কী তীব্র হাহাকার আর বাঁচার লড়াই তা তিনি টের পেলেন কাছারিঘরে বসার পর।

একদিন দুপুরের দিকে কাছারিঘরের বাইরে একটা শোরগোল শোনা গেল। নায়েবমশাই কাকে যেন জোর গলায় ধমকাচ্ছেন। রবি খাতা থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন–
"বাইরে কীসের এত চিৎকার, নায়েবমশাই?"

নায়েবমশাই হাত কচলাতে কচলাতে বললেন–
"কিছু না ছোটবাবু, এক বুড়ো চাষি এসেছে। খাজনা দিতে পারছে না অথচ এখানে এসে প্যানপ্যান করছে। আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।"

রবি কলমটা রেখে বললেন–
"না, এটি তো ঠিক হয়নি। তাড়াবেন কেন? ওকে ভেতরে আসতে দিন।"

ভেতরে ঢুকল এক বৃদ্ধ চাষি। গায়ে শুধু একটা মলিন গামছা জড়ানো, পা দুটো কাদায় মাখা। কার্পেটের মেঝেতে দাঁড়াতে বড্ড সংকোচ হচ্ছিল লোকটার। সে দরজার কাছেই ধপাস করে বসে পড়ল। তার কুঁচকানো চামড়া আর রোদে পোড়া মুখের দিকে তাকিয়ে রবি এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। লোকটার চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে গাল ভিজে যাচ্ছে।

সে খুব নরম গলায় আমতা আমতা করে বলল–

"বাবু, এবার বানের জলে চরের সব ধান তলায়ে গেছে। ঘরে ছাওয়ালপাওয়াল তিন দিন ধইরা না খাইয়া আছে। খাজনাটা যদি এবার মওকুফ না করেন, তবে আমাগো না খাইয়া মরা ছাড়া আর কোনো পথ নাই।"

রবি চাষিটির এই অঝোর কান্না আর আকুলতা দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। কলকাতার বাবুয়ানি জমিদারদের মতো কোনো কঠিন কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোল না। তিনি টেবিলের ওপর রাখা খাজনার খাতাটা একপাশে সরিয়ে রেখে নায়েবকে বললেন–

"ওর এবারকার খাজনা পুরো মওকুফ করে দেন। আর কাছারিবাড়ি থেকে এদের জন্য জরুরি কিছু চালের ব্যবস্থা এখনই করেন।"

বৃদ্ধ চাষিটি কাছারিঘর থেকে বের হওয়ার সময় একবার ফিরে তাকাল। দুহাত কপালে ঠেকিয়ে নীরবে প্রণাম করল সে। তার চোখের কোণে তখনো জল ছলছল করছে। রবি কিছুক্ষণ ওই লোকটার দিকেই চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে খাতাটা নিজের দিকে টেনে নিলেন বটে কিন্তু হিসাবের পাতায় আর মন বসাতে পারলেন না। তারপর জানালা দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। খাতার পাতাগুলো খোলা, কিন্তু আর এগলো না কাজ।

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে ফিরে ডায়ারি খুলে বসেছিলেন তিনি। কলমের নিব কাগজ ছুঁয়েছিল কয়েক বার আবার থেমেও গিয়েছিল। কলম ধরলেই বৃদ্ধ চাষিটির মুখটা মনে পড়ছে বারবার। কয়েকটি লাইন লিখে আবার থেমে গেলেন তিনি।

জমিদারির এই পাট চুকিয়ে জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি ১৯০১ সালে বীরভূমের শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। তাঁর আসাতে চারপাশের পরিবেশটা একদম বদলে যায়। ধু-ধু করা রাঙা মাটির এই প্রান্তরে তিনি নিজের মতো করে গড়ে তুললেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। শান্তিনিকেতনের এই লাল মাটির মেঠো পথ ধরে হাঁটার সময় প্রায়শই তাঁর চোখে পড়ত প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য।

এখানে বসেই কবি অন্তরের গভীর আধ্যাত্মিক সাধনা ও ঈশ্বরের প্রতি পরম ভক্তির ডালি সাজিয়ে লিখতে শুরু করলেন 'গীতাঞ্জলি'। ভোরের আলো ফোটার আগেই তিনি প্রায়শই আশ্রমের মেঠো পথ ধরে হাঁটতে বের হতেন। রাঙা মাটির ওপর তখনো শিশিরের শোভা লেগে থাকত। দূরে ছাতিমগাছের ছায়া, কোথাও পাখির ডাক, কোথাও বা নিস্তব্ধতার দীর্ঘ বিস্তার। সেই নীরবতার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে যেতেন তিনি।

ফিরে এসে লেখার টেবিলে বসতেন। কখনো দীর্ঘক্ষণ কলম স্থির থাকত আঙুলের ডগায়। তারপর হঠাৎ কয়েকটি পঙ্‌ক্তি নেমে আসত কাগজে। বাইরে তখনো ছাতিমগাছের ছায়া সরে যায়নি।

১৯১৩ সালের ১৫ নভেম্বর। বায়ান্ন বছরের প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ তখন আশ্রমে তাঁর নিজের ঘরে সাধারণ পোশাকে একা বসে ছিলেন। মাথার চুল আর লম্বা দাড়ি এখন ধবধবে সাদা। চারপাশের পরিবেশটা বড্ড শান্ত।

এমন সময় দূর থেকে বোলপুর পোস্ট অফিসের একজন পিওন প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে আশ্রমের দিকে এগিয়ে এলো। তার হাতে একটা মোড়ানো খাম। পিওনের বুকটা ধকধক করছিল উত্তেজনায়। সে রবির ঘরের সামনে এসে সেখানে থাকা রবির বন্ধু সি এফ এন্ড্রুজসহ লোকজনদের হাঁপাতে হাঁপাতে বলল–

"কলকাতা থেইকা বড্ড জরুরি একটা তার আইছে। বোলপুর আপিসে এইমাত্র ঢুকল।"

১৩ নভেম্বর সুইডিশ একাডেমির সেই চূড়ান্ত ঘোষণার পর রয়টার্সের মাধ্যমে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্ব জুড়ে। লন্ডনের বিভিন্ন পত্রিকায় তা ছাপা হতেই পুরো শহরে তোলপাড় পড়ে যায়। খবর পাওয়ামাত্রই কলকাতার সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস থেকে কবির ছোট জামাই নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই জরুরি তারবার্তা পাঠিয়েছেন শান্তিনিকেতনে।

আশ্রমের শিক্ষক, ছাত্র এবং কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু সি এফ অ্যান্ড্রুজ টেলিগ্রামের কাগজটি হাতে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করতে করতে কবির ঘরের দিকে ছুটে গেলেন। অ্যান্ড্রুজ সাহেব টেলিগ্রামের কাগজটা রবির চোখের সামনে মেলে ধরে রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন–

"রবীন্দ্রনাথ! দেখো দেখো! এক কাণ্ড ঘটে গেছে! সুইডেন থেকে বড় খবর এসেছে!"

আশ্রমের শিক্ষক-ছাত্ররা ততক্ষণে খবরটা জেনে কবিকে ঘরে এসে ঘিরে ধরেছেন। সবার চোখে-মুখে এক অবিশ্বাস্য আনন্দের আমেজ। তাঁরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন–

"রবিদা, আমরা এক বিরাট খবর পেয়েছি! আপনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন! ওই গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ 'Song Offerings'-এর জন্য সুইডিশ একাডেমি আপনাকে সাহিত্যে নোবেল দিয়েছে! সারা এশিয়ার মধ্যে আপনিই প্রথম এই সম্মান পেলেন!"

পুরো আম্রকুঞ্জ তখন হাততালিতে মুখর। কেউ কেউ শঙ্খধ্বনি করতে লাগলেন। কিন্তু এত কোলাহল, উল্লাস আর হইচইয়ের মাঝেও রবি কেমন যেন সম্পূর্ণ স্তব্ধ, শান্ত ও ধীরস্থির হয়ে রইলেন। তিনি তাঁর হাতের টেলিগ্রামের কাগজটার দিকে একবার তাকালেন।

সকলের বাঁধভাঙা উল্লাস দেখে তিনি মৃদু হাসলেন। তারপর অত্যন্ত শান্ত গলায় বললেন–

"তা তো এখন থেকে আমার শান্তিতে থাকার দিন শেষ হলো। এবার চিঠিপত্র আর অভিনন্দনের বন্যায় আমার নির্জনতাটুকু কেড়ে নেবে।"

চারপাশের মানুষের কোলাহল তখনো চলছিল কিন্তু রবির সেই শান্ত ও উদাসীন বাণী চারপাশের সমস্ত কোলাহলকে কিছুটা থমকে দিল।

"বিশ্বজোড়া খ্যাতির ভিড়েও তাঁর চোখে যেন অন্য কোনো দৃশ্য ভেসে উঠেছিল।"

বিকেলের আলোটা আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে এলো। সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে আসছে। কোপাই নদীর দিক থেকে একটা ঠান্ডা হাওয়া বয়ে এলো রাঙা মাটির পথে। রবি তাঁর চাদরটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিলেন। হাতে লাঠিটা নিয়ে তিনি আবার হাঁটতে শুরু করলেন সেই মেঠো পথ ধরে।

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

সাভার, হেমগঞ্জ বাজার, নান্দাইল, ময়মনসিংহ

দেশনেত্রী

তোমার নাম উচ্চারিত হলে দূরের কোনো নিশান হঠাৎ বাতাসে জেগে ওঠে,
আর এক ক্লান্ত জাতির দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে রূপ নেয় প্রত্যয়ের গভীর ভাষায়।
তুমি কেবল একজন মানুষ নও
সময়ের বুক চিরে এগিয়ে যাওয়া এক অস্থির ইতিহাসের দীর্ঘ প্রতিধ্বনি,
যেখানে পরাজয়ের ভেতর থেকেও মানুষ আবার উঠে দাঁড়ানোর শক্তি খুঁজে পায়।
কারাগারের নীরব দেয়াল জানে
কত দীর্ঘ রাত তুমি অন্ধকারের সঙ্গে মুখোমুখি বসে কাটিয়েছ,
যখন কঠিন নীরবতা চারদিকে জমাট বেঁধেছিল,
অনিশ্চয়তার ভারী ছায়া ঢেকে দিয়েছিল জনপদের আকাশ।
তখনো তোমার কণ্ঠে ছিল ভাঙতে না শেখা এক দৃঢ়তার ধ্বনি,
যেন সমস্ত ভয়, দমন আর নিঃসঙ্গতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা
এক অনমনীয় প্রতিজ্ঞার অগ্নিস্বর।
'আপসহীন' শব্দটি কেবল অভিধানের কোনো সাধারণ উচ্চারণ নয়;
এ এক দীর্ঘ দহন, অসংখ্য আঘাত,
অবিচল সাহসের ভেতর থেকে উঠে আসা এক নারীর পরিচয়।
যে নারী ঝড়ের গভীরে দাঁড়িয়ে থেকেও নিজেকে ভাঙতে দেয়নি,
যে জানত কখনো কখনো একাকিত্বই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সাহস,
আর নীরব প্রতিরোধই হয়ে ওঠে ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল ভাষা।
রাজনীতির নির্মম অঙ্গনে,
যেখানে প্রতিটি সিদ্ধান্ত বহন করে হাজার মানুষের অদৃশ্য কান্না,
সেখানে তুমি হেঁটেছ এক অনিবার্য দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে।
কখনো জনসমুদ্রের প্রবল উল্লাসের মধ্যে,
কখনো বিশ্বাসঘাতক সময়ের তীক্ষ্ণ অন্ধকারে, তুমি থেমে যাওনি;
বরং প্রতিটি পতনের পর আরও দৃঢ় হয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছ।
ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে তুমি আবার মুখ তুলেছ নতুন ভোরের দিকে,
যেন নিভে যেতে যেতে আরো দীপ্ত হয়ে ওঠা শেষ প্রদীপের আলো।
ইতিহাস কাউকে সহজে গ্রহণ করে না;
ইতিহাস অপেক্ষা করে সেই মানুষের জন্য,
যে দুঃসময়ের ভেতর থেকেও নিজের বিশ্বাসকে অক্ষত রাখতে পারে।
তুমি সেই বিরল মানুষদের একজন,
যাদের উপস্থিতি শুধু রাজনীতিকে নয়,
বরং একটি দেশের মানুষের আবেগ, আশা এবং সংগ্রামের ভাষাকেও বদলে দেয়।
দুঃখ দীর্ঘকাল তোমার পাশে হেঁটেছে,
তবু তুমি ক্লান্তির কাছে মাথা নত করোনি;
অবহেলা, অপবাদ, বিচ্ছিন্নতা সবকিছুকে অতিক্রম করে তুমি দেখিয়েছ যে নেতৃত্ব মানে কেবল ক্ষমতা নয়,
বরং ক্ষত নিয়েও অটল থেকে এগিয়ে যাওয়ার অনন্ত সাহস।
আজ যারা তোমাকে স্মরণ করে
তারা কেবল একজন নেত্রীকে স্মরণ করে না;
তারা স্মরণ করে এক উত্তাল সময়, এক সংগ্রামী প্রজন্ম,
এবং দীর্ঘ প্রতিরোধে গড়ে ওঠা এক ইতিহাসকে।
'দেশনেত্রী' শুধু একটি উপাধি নয়; এ এক জীবনের বহন করা ঝড়ের নাম,
অসংখ্য অশ্রু পেরিয়ে অর্জিত সম্মান,
এক নারীর অবিনাশী মানসিক শক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর।
মানুষের গভীর স্মৃতিতে তুমি থেকে যাবে
অশান্ত সময়ের অনমনীয় মুখ হয়ে,
নিঃশব্দ সাহসের অনির্বাণ প্রতীক হয়ে,
এক দেশমায়ের অটল ছায়া হয়ে।

ইকবাল খান
ইংরেজি বিষয়ের প্রভাষক, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানা, ঢাকা

বাবা নামের আকাশ

বাবা নামের আকাশ জানি
বিশালতায় ভরা
বাবার শেখা নৈতিকতায়
এই আমি তাই গড়া।

দেশকে ভালোবাসতে শেখায়
শেখায় নিয়মনীতি
বাবার কাছেই সকল আদর
আমার প্রাণের প্রীতি।

পড়ার ছলে গল্প শোনায়
বাবা আমায় রোজ
ঠিক সময়ে খাচ্ছি কিনা
তারও রাখেন খোঁজ।

বাবা হলেন উদার আকাশ
মায়ায় ভরা মন
মায়ের মতো বাবাও আমার
প্রিয় আপনজন।

সোমা মুৎসুদ্দী
আবৃত্তিকার ও উপস্থাপিকা
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

এই ছোট গাঁয়ে

এইখানে মেঠোপথ এইখানে নদী
এইখানে সারা দিন থাকতাম যদি!
কিশোরের সাথে সাথে জাল নিয়ে বিলে
মাঠ, নদী পেরোতাম আকাশের নীলে।
ধারে ধারে বিউ ফুল আছে বেশ ফুটে
এই জল কলকল কার পানে ছুটে!
বাঁশঝাড়ে ঝাঁক বেঁধে পাখিদের মেলা
এইটুকু পানিতেই পুঁটিদের খেলা!
সাদা বক চুপিচুপি খাড়া এক পায়ে
আমি যদি থাকতাম এই ছোট গাঁয়ে!

পাল বেঁধে মেঘ চড়ে পাল বেঁধে গরু
আলপথে ছেয়ে গেছে ঘাসফুল, তরু।
নদীপাড়ে কুঁড়েঘর আছে একখানি
আঙিনায় এসে গেছে জোয়ারের পানি।
ঝাঁক বেঁধে হাঁসগুলো জলে করে নাচ
ছেলেমেয়ে গুণে যায় তিন, চার, পাঁচ।
আকাশের বুকে ওড়ে ঘুড়ি সারা বেলা
ধান ছিটে বসাতাম পাখিদের মেলা।
এই পথ ওই পথ ঘুরে নিরবধি
এইখানে সারা দিন থাকতাম যদি!

আরজাত হোসেন
চা-বাগান, জোয়ারিয়া নালা, রামু, কক্সবাজার

শ্রাবণধারার সুর

জলদ ডানায় ভর করে আজ আকাশ হলো কালো,
দিনের বুকেও নিভে গেল চেনা রোদের আলো।
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হঠাৎ শ্রাবণধারার টানে,
মনটা আমার যায় হারিয়ে কোন অজানার পানে।

গাছের শাখা সিক্ত আজি, কদম ডালে হাসি,
বকুল, বেলি, হাসনাহেনায় সুবাস রাশি রাশি।
সবুজ পাতা আহ্লাদে আজ মেতেছে উল্লাসে,
নতুন করে চিত্ত ভিজে হাওয়ারই ফিসফাসে।

ভিজে সায়াহ্নে শ্যামা কোকিল মিষ্টিকণ্ঠে ডাকে,
থমকে থাকা অভ্রমালা গগন ঘেঁষে আছে।
ঝরনাধারার চপল নূপুর অদ্রিকোলে বাজে,
বুনো লতারা সেজেছে আজ নব নীলাম্বর সাজে।

তিমির রাতে মেঘমায়ার এই অঝোর জলধারা,
নিঝুম গাঁয়ে ক্লান্তি নামে জগৎ সাড়াহারা।
টিনের চালে বারিধারার মাতাল করা সুর,
ভাবনাগুলো কল্পনাতে ছুটছে বহুদূর।

মারিয়া জান্নাত জুনায়রা

আরাধ্যা

আমার জীবনে আমি বেশ কিছু বিরল মনুষ্যত্ববোধের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তন্মধ্যে এই মেয়েটি একটি।

এবারের ঈদের ছুটিটা গ্রামের বাড়িতেই কাটিয়েছি। আমার গ্রামের বাড়িতে মুখোমুখি পাশাপাশি মিলিয়ে কম হলেও সাত থেকে আটটি ঘর আছে। সেখানে সকলেরই বংশগত পদবি হলো সিকদার। তাই সেখানে কর্তা সকলকে জ্যাঠা-কাকা বলেই ডাকা। সত্যি বলতে সম্বন্ধটা এর চেয়ে ভিন্নও কিছু নয় ; আর পাঁচ দশটা জ্যাঠা-কাকাদের মতোই।

এই মেয়েটি আমাদের ঘরের পাশের ঘরের এক কাকার মেয়ে। সেও তাই আমাদের কাকাতো বোনই। কিন্তু ওর প্রকৃত পরিচয়টা ঠিক কী তা-ই আমি আজও ঠাওর করতে পারিনি ; বোধ করি এজন্যই আমার আজ লিখতে বসা।

সে খুব আগের কথা। ঘটনাটি আমারও খুব ঝাপসা হয়ে এখনো মনের কোথাও একটা টিকে আছে। তখন আমিও বোধবুদ্ধির দিক থেকে ভীষণ খাটোই ছিলেম। শীতের সকালে সকলে যখন সকালের খাওয়াটা রোদের মৃদু উষ্ণতায় সেরে নিচ্ছিল তখন আমি মাটি পুড়ে বানানো ছোটো একটা চাকা দিয়ে খেলছিলাম। সেটিকে গড়িয়ে গড়িয়ে উঠানের এ মাথা থেকে ও মাথায় গড়িয়ে উঠানের এ মাথা থেকে ও মাথায় নিচ্ছিলাম আর কি, তার গতিপথ যত সোজা যত দীর্ঘ হয়, ততই যেন আমার আনন্দ। তখন উঠানের এক পাশে কাকি একটি বছর দেড়েকের ছোট শিশুকে পাশে একটি পাটিতে নিয়ে রোদে যে বসে ছিলেন, সেটা লক্ষ করা আমার আনন্দের কাছে বড্ড তুচ্ছই ছিল। মাটির সেই নিরেট চাকাটিকে দীর্ঘ পথ যাত্রা করাতে আমি যখন ব্যর্থ হচ্ছিলাম তখন সামান্য বোধের দ্বারা বুঝেছিলাম একমাত্র গতিই পারে একে দীর্ঘক্ষণ যাত্রা করাতে। সেই ভেবে আমার সেদিন আমার নাতিদীর্ঘ তনুর সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে গড়িয়ে দিলেম উঠানে। আমার সমস্ত শক্তিই যেন চাকাটিকে পথভ্রষ্ট করে নিয়ে গেল পাটিতে শোয়ানো ছোট্ট শিশুটির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে আমার অবচেতন মনের চেতনা ফিরে এলে পরে দেখলাম আর কয়েক মুহূর্ত বাদেই সেই ভারী চাকা একদম ওর মাথায় আঘাত করবে! কাকি এক ভীষণ চিৎকার দিয়ে উঠলেন, উঠানের সকলের দৃষ্টি চলে গেল শিশুটির দিকে আর আমার দৃষ্টিকে অপরাধবোধ আপনিই আপন চোখের পাতাকে কড়া হুকুম দিয়ে বন্ধ করে দিল। মুহূর্তেই একটা শোরগোল পড়ে গেল। আমি চোখ খুলে দেখলাম শিশুটি হাসছে আর চাকাটি ওর উপর থেকে ভেসে গিয়ে এইবারে তার দীর্ঘ যাত্রা সফল করে এগিয়ে চলছে উঠানের ওমাথার দিকে। সেদিন আমি এক নিমেষেই বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম যে, সত্যিই ওপরওয়ালা আছেন এবং তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়েই আছেন। তখন কাকি উচ্চঃস্বরে বলতে লাগলেন, "আইজ যদি মাডিডা এইহানে এট্টু উঁচা না হইত তাইলে ওয় কি থাকত!" সত্যিই থাকত কি না, সে আমি জানি নে কিন্তু নিশ্চিত পঙ্গুত্বের সেই দায় নিয়ে ও বাড়িতে আমি আর কখনো থাকতে চাইতাম না।

আজ সেই শিশুটির বয়স হলো তেরো বছর। আমাকে আর তনয়কে বাড়িতে আসতে শুনেই ওর আনন্দের সীমা যে কোথায় উঠে যায়, সেও বুঝতে পারা দায়। আমরা দুজন আবার টক খেতে ভালোবাসি। কিন্তু এই কথাটা ও যে কখন নিজের মনের গহিনে গেঁথে নিয়েছে, সে আমরা জানতেও পাইনি। গতবারে যখন বাড়ি গিয়েছিলাম গাছে ঝুলছিল চালতা আর কাঁচা আম। যাবার দিন বিকেলেই আমাদের বলে, "কি রে, তোরা চাইলতা খাবি?" আমাদের উত্তর শোনার আগেই ও ঘরে চলে গিয়ে একটা আধাপাকা চালতা, ছোটো বাটি আর একটি ছোট বঁটি নিয়ে এলো। দেখে মনে হলো চালতাটা আজকে পারা নয়। আমি নিমেষেই বুঝে

নিয়েছিলাম যে, ও ঠাকুমার থেকে নিশ্চয়ই শুনেছিল যে আজকে আমরা আসব। ওই ছোট বঁটিটি দিয়ে আমি চালতা কতদূর কাটতে পারতাম সে নিয়ে সন্দেহ থাকলেও অন্তত যে হাত পাঁচ-ছ বার কেটে পৌরুষত্বের প্রমাণ দিতাম সে সম্বন্ধে ছিলেম একেবারে নিঃসন্দেহ। ও চালতা কেটে বাটিতে রাখতে না রাখতেই সেটা আমাদের মুখে চলে যেত। খাওয়ায় যখন চরম ব্যস্ত ছিলেম তার মাঝেই একটু মনোযোগ হারিয়ে দেখলাম যে, ও যে ছোলাটা একটু গভীর থেকে কেটে ফেলছিল সেটা মুখে পুড়ে কয়েকটা কামড় দিয়ে ফেলে দিচ্ছিল। আমি দেখে ফেলতেই বললো, "আমাগো গাছের চাইলতা অনেক মিষ্টি না?" আমি এমনই নির্বাক হয়ে ছিলেম যে সেই কথার প্রতিউত্তরই করতে পারিনি। সেবার ও কোথা যে প্রায়ই এমন অক্ষত কাঁচা আম কুড়িয়ে নিয়ে এসে সেই ছোটো বঁটির সহযোগে এমনি সন্তর্পণে নির্বিকারভাবে দ্রুত কেটে চলত, তার সমস্তটা আজও আমায় ভাবিয়ে তোলে। আর সঙ্গে ও লবণ আর মরিচের গুঁড়া দিতে কখনোই ভুলত না। আর সন্ধ্যা থেকে রাতে খাওয়ার আগ পর্যন্ত ওদের ঘরে চলত আমাদের লেবুচোর খেলা। অবশ্য সেবারের ইতিহাসটা টকজাতীয় ফলের অভাবে চালতা আর কাঁচা আমের বাইরে গড়ায়নি। আর আমিও চলে আসার সময় ওর মলিন মুখটা বাদে অধিক কিছু ভাববার পাইনি।

কিন্তু এবারে? এবারে যেন ওকে নতুন করে চিনলাম। ঈদের দিনই ভরদুপুরে এবার বাড়ি গিয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল পরের দিন সকালেই বরিশাল চলে আসব। বিকেলের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল অনেক। তারপর ওদের ঘরের সামনে গিয়ে বসলাম। আমাদের দেখে ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওর মুখ দেখে বুঝলাম কোথাও একটা গভীর চাপা আনন্দ লুকানো। আমি বললাম, "এইখানে পেঁচি গাব আছে রে? বৈশাখ তো শেষ গাছের তলায় একটাও থাকবে না।" ও বলল, "হয়, ওই পুকুরপাড়ের গাছে আছে। পাইকা হলুদ হইয়া আছে।" আমরা দেখতে চাইলে আমাদের নিয়ে গেল সেখানে। দেখলাম গাছটিতে গাব আছে এবং পেকে হলুদ হয়েই আছে সত্যই কিন্তু সেগুলোর উচ্চতা কম করে হলেও একটা বিল্ডিংয়ের তিন তলা ছাড়িয়ে যাবে। গাছটা একটা ডোবার দিকে কিছুটা কাত হয়ে আছে, যা বছরের পর বছর ধরে পচা নোংরা জল ধারণ করে আছে। অর্থাৎ ঢিল মেরে যা সুবিধা হবে সেটা কেবল জলটাকে আরেকটু দূষিত হতে সাহায্য করা। তখন শুনলাম ও আপনা-আপনিই বলছে, "এই গাছটায় ওডা তো সহজই। দ্যাখ কী সুন্দর খাপে খাপে থালডি আছে।" কিন্তু আমি চোখ ভারী করে তাকিয়ে দেখতে পেলাম আরেক দৃশ্য। সেখানে পদে পদে শাখা প্রশাখা আছে সত্যই কিন্তু সবই যেন এই নব্য হওয়া বৃষ্টি শ্যাওলাগুলোকে জীবন্ত করে দিয়ে তার উপর এক গাঢ় সবুজ আস্তরণ ছেঁয়ে দিয়েছে। নিচে তাকিয়ে বুঝলাম যে, কোনোমতে একবার পা পিছলে পড়লে এই শাখাগুলোই বিশ্বাসঘাতকতা করে শরীরে কৃতিত্বের তো দাগ কাটবেই উপরন্তু হাত-পা ভাঙাটা পুরস্কার হিসেবে থাকবেই। কিন্তু এর চেয়েও ভয়ংকর হচ্ছে ওই ডোবাটা আর ওখানে থাকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীরা। ওদের কথা আলাদা করে না বলি আর। আমি আর তনয় হন্তদন্ত করে লগি (আংটাযুক্ত বাঁশের লাঠি) খুঁজতে লাগলাম। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে শুনতে পেলাম যে, গাছের মাথা থেকে কেউ বলছে, "নিচ থেকে সর! দূরে যা!"

পাশে দাঁড় করানো আরেকটি ছোটো মেয়ে তখন ওপরে আঙুল তুলে কী যেন একটা দেখাতে চাইল। আমি সেদিকে চেয়ে দেখতে পেলুম, সেই তেরো বছরের মেয়েটি পিছলে পড়ার ভয় উপেক্ষা করে ডোবার কথাও ভুলে গিয়ে গাবগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে তলায় ফেলছে আর বলে চলছে আমরা যেন তলায় না যাই। আমার পৌরুষত্বের সমস্ত মহিমা বিসর্জন দিয়ে আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম ওকে। নইলে কি আর; যদি কাউকে বলতাম ওর এমন দুটি জ্বলজ্যান্ত দাদা থাকতে ও এইটুকুনি মেয়ে হয়ে গাছে এমন নির্বিকারে উঠে গেল– এ কথা কজনই-বা বিশ্বাস করতে চাইবে! কিন্তু অপমান ও অপরাধবোধে আমার চোখ সেদিনের বুজে এলো না, যেদিন সে অজান্তে আমার হাতেই পঙ্গু হতে যাচ্ছিল আর আজ সে জেনে-বুঝেই আমার জন্যই পঙ্গু হতে যাচ্ছে! সবই বদলিয়েছে কিন্তু মুখে ওর সেই হাসিটিই লেগে আছে।

এই পেঁচি গাব আমার দ্বিতীয় পছন্দের ফল হওয়ায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা দুই ভাই মিলে যখন যে গল্পের ছলে ৩০-৩৫টি গাব সাবাড় করে দিয়েছি তা খেয়াল করবার অবকাশই পাইনি। আর ও পাশে বসে দু-একটি গাব খেয়েছে মাত্র। ও অবাক হয়ে বলল, "তোরা গাব এত ভালো খাও?"

আমি বললুম, "প্রচণ্ড। এটা আমার পছন্দের তালিকায় দ্বিতীয়। জাম হলো প্রথম আর দেশি খেজুর তৃতীয়।"

তখন ও আবারও আনমনে বলতে লাগল, "জাম গাছ তো একটা আছে জেঠিগো ঘরের পিছনে ব্যাড়ের পাশে। ঐডার গোড়া এত মোটা যে আমি কি, বড় মাইনসেও উঠতে পারে না। আবার আছে বেলের কাটা। আর ডাইয়ার (বড় বিষ পিঁপড়া) কথা কইলাম না।" আমরাও দেখলাম যে, ও যে বর্ণনা দিয়েছিল গাছটা তার চেয়েও ভয়ানক!

পরদিন সকালে কাঁচা খেজুরের দুই ছড়ি জোগাড় করে সেগুলোকে পাকাতে কাউফ্লা পাতা দিয়ে একটি হাঁড়িতে পানিতে চুবিয়ে রাখা হলো। আর একটু পরেই ও ডাক দিয়ে বলল, "কি রে ভাই, জাম খাবি?"

আমি দুই চোখ গোটা গোটা করে তাকাতেই বলল, "গাছে উডি নাই তো। ওই জেঠিগো পাকঘরের চালায় পইড়া আছিল। কালকে ঝড় হইল না অনেক! লামা দিয়া চালে হাত দিলেই জামডি হাতে আইয়া পড়ে।"

অবশ্য আমি মনে মনে ভেবেছিলাম যে, এবার যদি গাছে উঠত, তবে অপমানে বরিশাল চলে আসা ছাড়া আর গতি ছিল না।

এবারেও আমরা দুই ভাই মিলে জামগুলো যেমন প্রবল আক্রোশে খাচ্ছিলাম আর ও তেমনি প্রখর দৃষ্টিতে শুধু আমাদের খাওয়া দেখতে লাগল। শুধু দেখতেই লাগল! এবারে একটিও নিল পর্যন্ত না। দুপুরে আমাদের খালে ঘণ্টাখানেক ডুবাতে দেখে জিজ্ঞেস করল, "তোরা তো শহরে থাহো, কিন্তু হাঁতর শিখলি কেমনে?"

আমি না ভেবে আনমনেই দ্রুত উত্তর দিলাম, "সেইডা তো ঠ্যাকে পইড়া শহরে থাহি, নাইলে তো আমি গ্রামেরই লোক।"

দেখলাম ও চুপ থেকে কোথাও একটা চলে গেল। তারপর আমার উত্তরটাকে আমি আপনিই ভেবে দেখলাম আর বুঝতে পারলুম, লোকের না ভেবে বলা সকল বাণীই সত্য, একটু ভাবলেই তাতে মিথ্যে এসে জুড়ে বসে।

পরদিন সকালে চোখ মুখ না ধুয়েই চলে গেলাম হাঁড়িটির কাছে। গিয়ে দেখলাম আশাটা অপূর্ণ থেকে যায়নি। সত্যিই দেখি কমলা রঙের খেজুরগুলো পাণ্ডুর হয়ে মেটে বর্ণ ধারণ করেছে। আমি তখনই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলুম। মুখ ধুতে যাওয়ার সময় ঠাকুমাকে বলে গেলাম যেন বড় একটা বাটিতে অনেকগুলো তুলে বারান্দায় রেখে আসে, কারণ এতে অনেকের ভাগ আছে প্রায় জন পাঁচেকের। যে ছোকরাটা পেড়ে দিয়েছিল সে আমাদের সঙ্গে কতক্ষণ খেয়ে এরপর তার আপন ভাগ নিয়ে চলে গেল। কিন্তু ভাগীদার হিসেবে সেই মেয়েটি খেজুর খেয়ে খেয়ে আঁটি দিয়ে হাতের মুঠো একেবারে ভরে ফেলেছিল এবং যদি গণনা করা হতো তবে বোধ করি পাঁচ-ছয়টির বেশি আঁটি ওতে পাওয়া যেত না। ওর ছোট বোনটিও আমাদের সাথে খাচ্ছিল কিন্তু দিদির চোখ রাঙানির ভয়ে মুখ থেকে আঁটি বের করতে ভয় পাচ্ছিল, পাছে যদি ধরা পড়ে কতগুলো খেয়েছে! যখন আমি জনসম্মুখে প্রচণ্ড খাওয়ায় পেট ব্যথার কথা জানিয়ে দিয়ে বললাম যে, আর একটি খাওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব না, তখন দেখলুম, ও তার বোনের হাতে কয়েকটি খেজুর তুলে দিয়ে বলল, "যা, মারে দিয়া আয়।"

এদিকে পেটব্যথার তাড়নায় আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। গিয়ে শুয়ে পড়লুম। কিছুক্ষণ বাদেই ওর বোন এসে বলল, "তোমাগো দিদি বোলাইছে।"

আমি বললুম, "না রে ভাই। অনেক পেটব্যথা। পরে যাব খন।"

ও বলল, "দিদি জাম পাড়ছে।"

তখন উঠে এলেম বিছানা থেকে। মনে মনে বললাম , "ধুর, জামের কাছে আবার পেটব্যথা!"

গিয়ে দেখলাম সত্যিই বাটিতে কতগুলো জাম রাখা। জিজ্ঞেস করলাম, "কাইল তো ঝড় হয় নাই। এইগুলা পাইলি কই?"

ও আবারও বলল যে, চালায় পড়ে ছিল নাকি।

আমি আর তনয় সরল মনে বিশ্বাস করে খেতে লাগলুম। দেখি ওর বোনটি পাশে দাঁড়িয়ে কাচুমাচু করছে। বললাম, "খাবি?"

সঙ্গে সঙ্গে ডানে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে যেই না দিদির দিকে তাকাল আর সেই চোখ রাঙানি দেখে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটি ওপর নিচে নড়তে শুরু করল। আমি বাটি এগিয়ে দেওয়ার পরও একটিও মুখে নিলে না। আর ও? ওর তো সেই একটি কাজ খাওয়া দেখতে থাকা কেবল।

পরদিন থেকে দিনে দুইবার জামসেবা চলত। একবার সকালে যেটা চালায় পড়ে থাকত, আরেকবার বিকেলে যেটা ও বাড়ির কে যেন গাছে উঠে জাম পেরেছে তার ভাগটা থেকে আসত। আর যে গাছে উঠত সে মাঝে মাঝে কিছু নিচেও ছুড়ে দিত, তার মধ্যে সব থেকে অক্ষত জামগুলো তুলে নিয়ে এসে নিভৃতে ওর বোনের চোখ এড়িয়ে আমাদের দিয়ে যেত। ওকে একটাও খেতে দেখিনি আমি।

এরপর যেদিন চলে আসব সেদিন আবারও সকালে ডাক এলো। দেখলাম আজ একটা বড় বাটিতে কেজি দুই জাম তোলা, যা পরিমাণে প্রতিবারের তুলনায় অনেক বেশি। ওকে কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলুম, "কি রে, এবারও সব চালায় পেয়েছিস নাকি?"

তখন এলো এক ভিন্ন উত্তর, যা আমাকে আবারও অপমানবোধে জর্জরিত করে দিয়েছিল। ও বলল, "আরে না, এফিরগো, পাশের আমগাছটা বাইয়া জাম গাছের একটা ঠাল লাগর পাইছিলাম। হেইডায় অনেক জাম আছিল। কিন্তু ডাইয়ার জ্বালায় বেশি আনতে পারি নাই।" অপমানের কথা ভুলে আমি শুধু এটাই ভাবছিলাম– দুই কেজি জাম ওর কাছে যদি অল্প হয়, তবে ওর কাছে যা বেশি তা আমাদের কাছে কেজি দশ ছাড়াবে কি না! খানিক বাদেই দেখতে পেলাম বাটির মাঝে মাঝে লাল বড় বড় বিষপিঁপড়া দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ ধুয়ে ফেলার পরও বাটিতে বিষপিঁপড়া রয়ে গেছে! আমি মনে মনে তখন শুধু একটি প্রশ্ন আপনাকে শুধাচ্ছিলেম, "তবে ওকে ঠিক কতগুলো দংশন সহ্য করতে হয়েছে? আর সমস্তটা কি শুধুই আমাদের খাওয়া দেখতে পাওয়ার আনন্দে? এত তীব্র দংশনের জ্বালা ওর কাছে কি তবে এতই তুচ্ছ সেই আনন্দের চেয়ে?" দেখলাম, আমার চোখে জল চলে এসেছে আর শুকিয়েও যাবে কিন্তু সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি কখনোই পাব না।

যখন চলে আসি তখন দেখতে পেলুম যে, ও একমনে উনুন ধরাচ্ছে। ভাবলাম একবার বলে আসি ওকে। কিন্তু যখন বুঝলাম ওকে দেবার মতো আমার কাছে কিছুই নেই, কিচ্ছুটি না ; এতটাই ক্ষুদ্র দাদা আমি যে সে সময় ওর মলিন মুখে সেই হাসি ফোটানোর জন্য দেবার মতো কিছু দিয়ে বিধাতা আমায় এ ধরায় পাঠাননি। তাই ওর থেকে কোনোমতে পালিয়ে চলে এসেছি বরিশালে।

দুপুরের দিকে বরিশালে পৌঁছেছিলাম আমরা। আর সন্ধ্যায় প্রযুক্তির সুবাদে আমি একটি সংবাদ জানতে পেরেছি। তা হলো : বিকেলে প্রথমে ও আমাদের ঘরে এসেছিল নাকি অনেকগুলো জাম নিয়ে। একটা নির্মম সত্য জানার পর ও মনে মনে বিলাপ করছে যে, এখন ওর জাম কে খাবে!

এখন ভাবছি আমি ওর কাছে এই প্রশ্নের কি কোনো উত্তর পাব না যে, "আচ্ছা আরাধ্যা, তুই আমাদের খেতে দেখে ঠিক কতটুকু আনন্দ পাও?"

আমি লিখতে লিখতে এখনো বিলাপ করছি, "হায় প্রভু! কেন তুমি আমায় এমন আনন্দ থেকে আজীবন বঞ্চিত করে গেলে!"

অনয় কুমার সিকদার
কালীবাড়ি রোড, বরিশাল সদর, বরিশাল

অপেক্ষার প্রহর

কে তোমার বাহিরে
এই বিশ্ব জুড়ে?
সবে লাটিম! গুটি? সে তো তোমার হাতে
তাই ঘুরি তোমার ইশারার জোরে
কত ঘুরাবে বলো
কী পাও এমন করে?

পৃথিবীর অমোঘ নিয়মেই তো
আমার এই ধরণিবুকে আসা,
যেখানে তোমার অনুগ্রহ পূর্ণ করেছে
পূর্বপুরুষের ভালোবাসা।

ক'দিনই-বা দেখি চাঁদ তারা
আমায় নিয়ে!
তাঁরা তো তেপান্তর,
না পাওয়া স্বপ্ন করে বিলাপে রোদন
কেউ এখানে করে না বসতঘর
হায়েনা শকুন যেখানে করেছে ভর।

আমি তো তোমার হিসেবের বাহিরে নই!
জানি, তুমি যখন দিবেই ঝড়,
কেন তব অপেক্ষা, আর কত
গুনি অপেক্ষার প্রহর?

আবু তৈয়ব মুছা
জীবন বিকাশ বেতার শ্রোতা ক্লাব
ভোকেশনাল মোড়
কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা

বাংলার বর্ষা

বর্ষা রানির শাপলা হাসি বৃষ্টি ভেজা কেশ,
প্রকৃতির এই নিত্য নীলায় মুগ্ধ আমার দেশ।
পথের পাশে দেবদারুরা ঠাঁয় দাঁড়িয়ে চুপ,
বর্ষা এলে ফুটে ওঠে বাংলা মায়ের রূপ।

কুমার কূলে নদের নাচন উথলে ওঠে ঢেউ,
রূপসি এই বাংলা আমার ভুলতে পারে কেউ?
মাল্লা-মাঝি পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে দূরের গাঁয়,
কলসি কাঁখে কাজল বধূ পিছন ফিরে চায়।

নন্দীপাড়ার মুক্ত মাঠে দুষ্টু কিশোর দল,
সোঁদা মাটির মধুর গন্ধে করছে কোলাহল।
সোনা ব্যাঙে গান ধরেছে বানর বাজায় বিন,
দরজায় এসে কড়া নাড়ে বৃষ্টি ভেজা দিন!

শুভ্র-ডানার গাঙ-চিলিরা উড়ছে দেখো ওই,
ভুবন ভরে এমন দেশটি খুঁজলে পাবে কই?
বর্ষামুখর এই দেশ আমার স্বর্গ সুধার সুখ,
কদম ফুলের বাংলা যেন মায়ের প্রিয় মুখ।

এম. জাহাঙ্গীর আলম

বর্ষার রূপ

বর্ষা মানে মেঘলা আকাশ
কালো মেঘের ছায়া,
ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ে
জাগে মনে মায়া।

বর্ষা মানে স্নিগ্ধ, শীতল
সবুজ পরিপাটি,
চারিদিকে শীতল হাওয়া
ভেজা কাদা মাটি।

বর্ষা মানে নদী-নালা
জলে থাকে ভরা,
কদম, কেয়া, বকুল ফুলে
সাজে রঙিন ধরা।

বর্ষা মানে বিলের জলে
শাপলা কলি ভাসে,
মাঝে মাঝে সুয্যি মামা
মুচকি দিয়ে হাসে।

শিউলী খাতুন
রাজেন্দ্রপুর বাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর

বেতার শ্রোতার চিঠি

শ্রোতা-যোগাযোগের নমুনা স্মারক

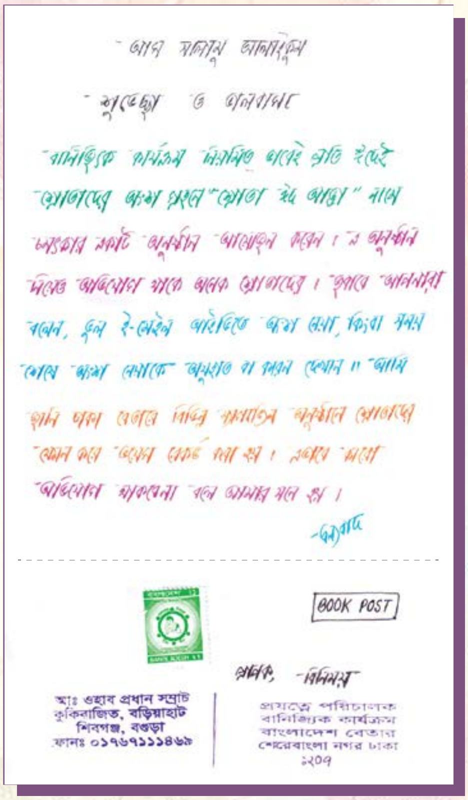
আস সালামু আলাইকুম

শুভেচ্ছা ও ভালবাসা

বানিজ্যিক কার্যক্রম নিয়মিত ভাবেই প্রতি হচ্ছে
শ্রোতাদের কথা শুনতে "শ্রোতা ও আড্ডা" নামে
সংস্কার একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। এ অনুষ্ঠান
নিয়ে অভিযোগ থাকে অনেক শ্রোতাদের। তাদের আপনারা
বলেন, ফোন ই-মেইল আইডিতে কথা বলা, কিংবা সময়
শেষে কথা বলাকে অনুরোধ বা স্মরণ দেখান। আমি
জানি ঢাকা বেতারে বিভিন্ন প্রকাশিত অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের
ফোন করে ভয়েস রেকর্ড করা হয়। এভাবে করলে
অভিযোগ থাকবেনা বলে আমার মনে হয়।

-ধন্যবাদ

BOOK POST

প্রেরক, -বিনিময়

আঃ ওহাব প্রধান সম্রাট
কুকিরাজিত, বড়িয়াহাট
শিবগঞ্জ, বগুড়া
ফোনঃ ০১৭৬৭১১১৪৬৯

প্রযত্নে পরিচালক
বানিজ্যিক কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার
শেরেবাংলা নগর ঢাকা
১২০৭

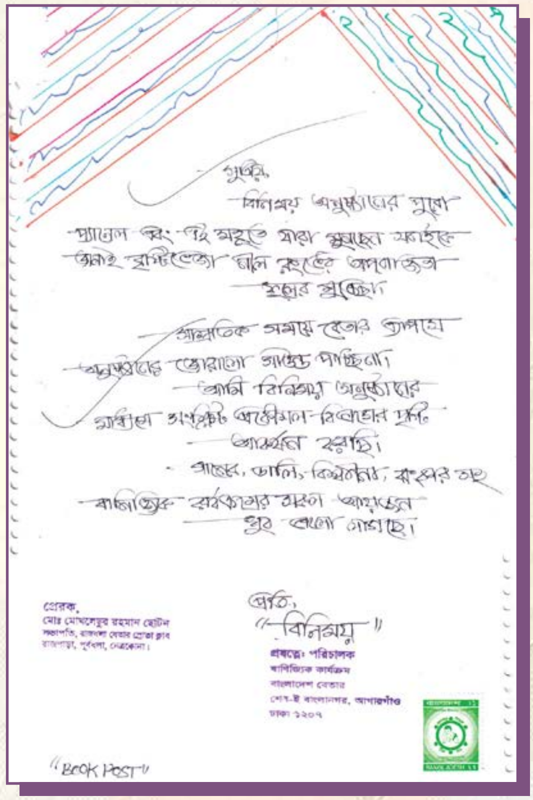
শুভেচ্ছা,

আবেদন করছি।

প্রতি,
"বিনিময়"

প্রযত্নে: পরিচালক
বাণিজ্যিক কার্যক্রম
বাংলাদেশ বেতার
শের-ই বাংলানগর, আগারগাঁও
ঢাকা ১২০৭

প্রেরক,
মোঃ মোখলেছুর রহমান মোটন
সভাপতি, রাজধলা বেতার শ্রোতা ক্লাব
রাজপাড়া, পূর্বধলা, নেত্রকোনা।

"BOOK POST"

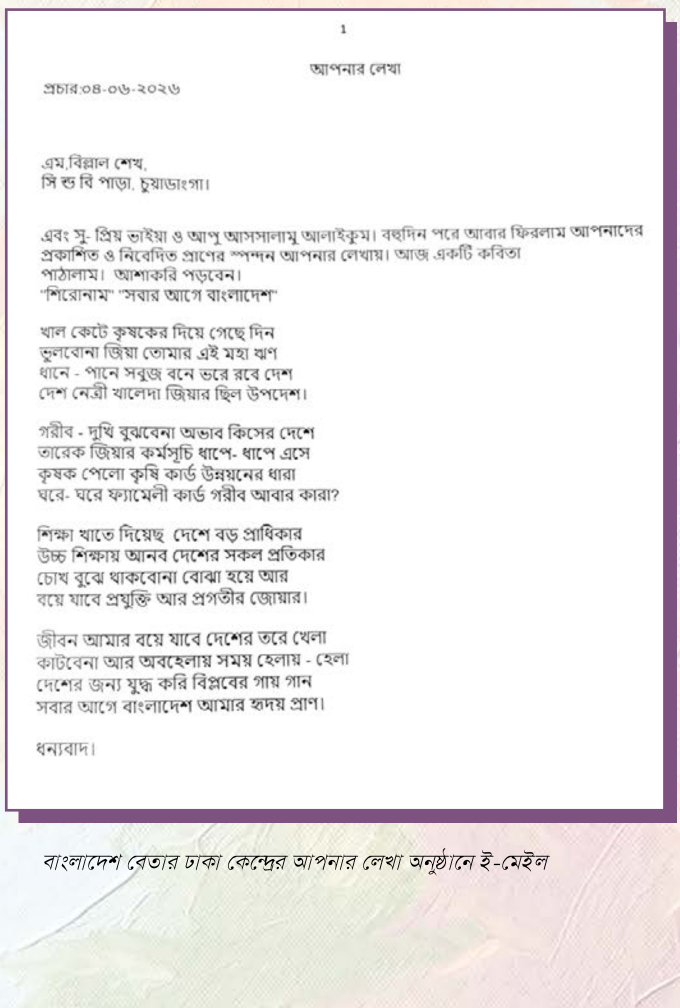
1

আপনার লেখা

প্রচার:০৪-০৬-২০২৬

এম.বিল্লাল শেখ,
সি এন্ড বি পাড়া, চুয়াডাংগা।

এবং সু- প্রিয় ভাইয়া ও আপু আসসালামু আলাইকুম। বহুদিন পরে আবার ফিরলাম আপনাদের প্রকাশিত ও নিবেদিত প্রাণের স্পন্দন আপনার লেখায়। আজ একটি কবিতা পাঠালাম। আশাকরি পড়বেন।
"শিরোনাম" "সবার আগে বাংলাদেশ"

খাল কেটে কৃষকের দিয়ে গেছে দিন
ভুলবোনা জিয়া তোমার এই মহা ঋণ
ধানে - পানে সবুজ বনে ভরে রবে দেশ
দেশ নেত্রী খালেদা জিয়ার ছিল উপদেশ।

গরীব - দুখি বুঝবেনা অভাব কিসের দেশে
তারেক জিয়ার কর্মসূচি ধাপে- ধাপে এসে
কৃষক পেলো কৃষি কার্ড উন্নয়নের ধারা
ঘরে- ঘরে ফ্যামেলী কার্ড গরীব আবার কারা?

শিক্ষা খাতে দিয়েছ দেশে বড় প্রাধিকার
উচ্চ শিক্ষায় আনব দেশের সকল প্রতিকার
চোখ বুঝে থাকবোনা বোঝা হয়ে আর
বয়ে যাবে প্রযুক্তি আর প্রগতীর জোয়ার।

জীবন আমার বয়ে যাবে দেশের তরে খেলা
কাটবেনা আর অবহেলায় সময় হেলায় - হেলা
দেশের জন্য যুদ্ধ করি বিপ্লবের গায় গান
সবার আগে বাংলাদেশ আমার হৃদয় প্রাণ।

ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের আপনার লেখা অনুষ্ঠানে ই-মেইল

২৪ মে ২০২৬ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন ঢাকায় সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা এবং তথ্য অধিদফতরের কর্মকর্তাদের 'নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন ও কর্মপরিকল্পনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। এ সময় তথ্য প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন

১৯ মে ২০২৬ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা ডাঃ জাহেদ উর রহমান এবং প্রধান তথ্য অফিসার সৈয়দ আবদাল আহমদ উপস্থিত ছিলেন

১৭ জুন ২০২৬ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবা ফারজানাকে বাংলাদেশ বেতারে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ

বেতারবাংলা রেজি: নং ডি-এ/৭ • বর্ষ ৫৪ • সংখ্যা-২ • আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪৩৩